মাসিক

আলোকধারা

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং-২৭২
১৯শ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৪ ঈসায়ী

গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি
সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী'র (কঃ) রওযা শরিফ

গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি
সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী'র (কঃ) মূল রওজা শরীফ

গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী'র (কঃ)
উরস অনুষ্ঠানে রাতের বেলায় আগত ভক্ত-জায়েরনীদের মিলন মেলা

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল- ২০১৪ ঈসায়ী
জমাঃ আউয়াল- জমাঃ সানী- ১৪৩৫ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ - ১৪২০/১৪২১ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ 01818 749076
01716 385052
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ 01819 380850
01711 335691

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোনঃ ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়ঃ
হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (ক.) ---------- ২
■ খোদায়ী নুরের উজ্জ্বল জ্যোতি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)
– ড. মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ---------- ৩
■ হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রঃ)'র জীবন ও কর্ম ঃ আধ্যাত্মিকতার আলোকে
– ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ৫
■ আহলে বায়তে রাসূল ঃ প্রসঙ্গ পবিত্রতা
– মুহাম্মদ রবিউল আলম ---------- ৮
■ মাইজভাণ্ডার শরিফে সত্যের সন্ধান
– এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী ---------- ১০
■ আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'
– অনুবাদঃ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর -------- ১৫
■ হযরত ফাতিমাতুজ জাহ্রা (রাদ্বি.) ও আজকের নারী সমাজ
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ১৯
■ মাইজভাণ্ডারী তরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
– ড. সেলিম জাহাঙ্গীর ---------- ২৩
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী - ২৭
■ যথার্থ সহায়ক শক্তি
– মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৩০
■ পূর্ণ মানবীয় সত্তা আল-ইনসান আল কামিল
– এ. এন. এম. এ. মোমিন ---------- ৩২
■ ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব -০৮
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ---------- ৩৫
■ আউলিয়ায়ে কিরাম ও বেলায়ত
– সৈয়দ আবু আহমদ ---------- ৩৮
■ ইসলামী সমাজে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা
– মাওলানা মোহাম্মদ নেজামউদ্দীন চিশ্‌তী ---------- ৪১
■ "আত্মশুদ্ধি ও আত্মার শুচিতা লাভ করতে হলে কামেল অলি আল্লাহ্ এর শরণাপন্ন হতে হবে"
– সৈয়দ নুর আহমেদ বাবর ---------- ৪৭

সম্পাদকীয়...

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (ক.)

ম্যায় হুঁ মসৃত খেয়ালে ভাণ্ডারী,
রূহ্ ব রূহে জামালে ভাণ্ডারী।
ছুনকো হালে জালালে ভাণ্ডারী,
আপকা ছিনা মখজনে ইরফা,
দরছে হিম্মত মকালে ভাণ্ডারী,
যো কী ছালে রসূলে আকরম হ্যায়।
হ্যয় ওলী আলে তালে ভাণ্ডার,
কহি ছুফী বনে আউর কঁহি ছালেক।
ইয়াহে আদ্না কামালে ভাণ্ডারী,
ম্যায় তাছউরমে দিন্ ও রাত নইয়্যার।
দেখতা হু জামালে ভাণ্ডারী,
ম্যায় হুঁ মসৃত খেয়ালে ভাণ্ডারী।

মারিফাত জগতে 'ইউসুফে ছানী' হিসেবে অভিহিত হযরত কুতুবুল আক্তাব মাহবুবে ছোবহানী শাহসূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার (ক.) শানে নিবেদিত তোফায়েল আহমদ নইয়ার নিবেদিত এই গজলের মধ্যে এই মহান ওলী আল্লাহর অন্তর-বাহিরের এক অনবদ্য শব্দ চিত্র ফুঠে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতে মারিফাত জগতের এক অপূর্ব নিদর্শন হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (ক.)। মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্ম শরাফতের মহান প্রতিষ্ঠাতা, লেওয়ায়ে আহমদীর ঝান্ডা বরদার হযরত গাউসুল আ'যম শাহসূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কেবলা কাবার (ক.) নূরানী ছত্রছায়ায় বিকশিত হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কেবলা মাইজভাণ্ডার দরবার কিংবা উপমহাদেশের আধ্যাত্ম কাননে নন, বিশ্বের মারিফাতের বাগানে 'গুলে গোলাব' অর্থাৎ গোলাপ ফুল। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী শাহসূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) কেবলা কাবা তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) জীবন সাধনা ও আধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে হযরত ছাহেব কেবলা কাবার প্রদত্ত এই বিশেষণের সার্থক বহিঃ প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছে।

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা মারিফাতের রহস্যের ভাণ্ডার কিম্বা জীবন্ত মোড়ক যেন! মুখে শব্দহীন থাকতেন তিনি, অথচ তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ছিল বাঙ্ময়। সাধনা ও জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি নিজেকে করেছিলেন শারীরিকভাবে নিশ্চল, অথচ তাঁর সমস্ত সত্তা যেন ছিল দৃষ্টির মত অদৃশ্যভাবে সচল। যা চার পাশের সমস্ত সত্তার উপর বর্ষণ করতো 'রূহানী' প্রশান্ত মেহেরবানীর ধারা। তাঁর নূরানী অবয়বের দর্শন একদিকে যেমন সৃষ্টি করতো নিরুত্তাপ দহন ও আলোড়ন অন্যদিকে তেমনি সজ্ঞান স্তরে পরিবেশন করতো নিবিড় প্রশান্তি, যা ক্লান্ত অথচ অবিশ্রান্তভাবে ছুটে চলা মানুষের মনে আশা জাগাতো, ভরসা জাগাতো। জাগাতো নতুন করে স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রত্যয়।

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী শাহ সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (ক.) আধ্যাত্ম কল্যাণ ধারার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন সার্থকভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মহাবিশ্বে এক প্রকার অসহায় মানবতার কল্যাণ সাধনের মহান ব্রত নিয়ে প্রবর্তিত এই মানবতাবাদী তরিকার মর্মবাণীকে আপন মহিমায় দেদীপ্যমান করে উৎক্ষেপন করার সুকঠিন ব্রত পালন করেছিলেন হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.)। প্রকৃতির অদৃশ্য উপাদান সমূহের মতো তাঁর নীরব অথচ সক্রিয় কল্যাণময় উপস্থিতি মানব জাতির কাছে এক অনাবিল ভালোবাসা। প্রেমময়তার স্নিগ্ধ সুবাতাস বিলিয়ে অপূর্ব ঐশী এক পরিবেশ উপহার দিয়েছিলেন পৃথিবীকে। এই মহান আধ্যাত্ম সাধক বে ভোলা বাউল দীওয়ানদের শামা বা প্রদীপ হিসেবে বিদ্যমান থেকে আকর্ষণ করে চলেছেন মারিফাতের প্রতঙ্গ পরোয়ানাদেরকে। সর্বপ্রেমবাদের এমন দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (ক.) মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্ম সংস্কৃতিক জগতের যে অবয়ব গড়ে তুলেছিলেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণে-বৈচিত্রে সুশোভিত হতে থাকে এবং শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে বৈশ্বিক ব্যবহারিক চেতনার মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বিশ্বমানবতাকে অভিন্ন মানবিক চেতনায় গ্রথিত করে চলেছে। এই মহান হাস্তির পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর মহান আধ্যাত্ম সত্তার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই এবং তাঁর মেহেরবাণী কামনা করি। তাঁর মহান দরবারে সালাম জানিয়ে আবার নিবেদন করি:

এ্যয় গাউসুল আ'যম বাবা ইছমে আ'যম
তুমি নূরে আলম বাবা তরানে ওয়ালা।
নাম ধইরাছ ভবে হক ভাণ্ডারী
তুমি তৌহিদের কাণ্ডারী নূরী মাওলা।

খোদায়ী নুরের উজ্জ্বল জ্যোতি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)

• ড. মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন •

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আ'যম শাহ আহমদ উল্লাহ কেবলায়ে আলমের বাগানের নুরী গোলাপ হযরত শাহ সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর শানে লেখা আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) এর কবিতার দু'টো পংক্তি দিয়ে শুরু করছি–

বা-খেতাবে বাবাজান ক্বেবলা শুদাহ মাশহুর-দা
উ-গুলে আয বাগে আঁ শাহ আহমদ উল্লাহ বেগুমাঁ
বু-দ-উ মাজযুবে সালেক দরমিয়ানে আউলিয়া
নূরে চশমে আহমদ উল্লাহ গাউসুল আ'যম মারহাবা।[১]

সত্যিই তিনি ছিলেন হযরত কেবলার নয়নের মণি, শরীয়ত ও তরিক্বতের সর্ববেষ্টনকারী বাগানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। যার আলোতে গোটা দুনিয়া আলোকিত এবং যার খুশবোতে দুনিয়াবাসী আজ মতোয়ারা। ১২৭০ বাংলার ২৭ আশ্বিন সোমবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে শুভ জন্মের পর তাঁর প্রতি প্রথম কৃপার নজর দিয়েছিলেন শাহ আহমদ উল্লাহ ক্বেবলায়ে আলম। শুভ বেলাদতের সপ্তম দিবসে আকিকার পবিত্র অনুষ্ঠানমালা শেষে স্বীয় আব্বাজান শাহসূফি মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম আল হাসানী (র.) সুবাসিত কাপড়ে জড়িয়ে স্বীয় নুরী পুতুলকে নিয়ে হাজির হলেন আপন বড়ভাই হযরত ক্বেবলার দরবারে। হযরত আকদছ ইউছুফে ছানীকে প্রথম দেখাতেই কোলে তুলে নিলেন, দয়ার নজর দিলেন এবং কালাম করলেন, "ইয়ে হামারে বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউছুফ (আ.) কা চেহারা ইছমে আয়া হ্যায়, উছকো আজিজ রাখহো, মাইনে উছকা নাম গোলামুর রহমান রাখহা।" অর্থাৎ এ শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউছুফ (আ.) এর রূপ তাঁর মধ্যে বিকশিত, তাঁকে যত্ন করবে, আমি তাঁর নাম রাখলাম গোলামুর রহমান।[২]

মুলতঃ হযরত কেবলা সেদিন ইউছুফে ছানী বাবা ভাণ্ডারী কেবলায়ে আলমকে প্রথম কোলে তুলে নিয়ে চেহারায়ে পাকের দিকে নজর করতেই স্বীয় বাগানের ফুটন্ত গোলাপের মুকুলে ঢেলে দিয়েছিলেন খোদায়ী নেয়ামতের অফুরন্ত সওগাত। আপন পরিচর্যায় গ্রহণ করলেন গাউসিয়তের মহা উদ্যানের শ্রেষ্ঠ রুহানী সন্তানকে। বানিয়ে দিলেন বিশ্বের কোটি মানুষের অভিভাবক। তাই তিনি আজ বাবাজান। তিনি আজ বাবা ভাণ্ডারী। পৃথিবীতে আগমনের সপ্তম দিবসে হযরত কেবলার সুযোগ্য উত্তরসূরী গাউসুল আ'যম বিল বিরাসত শাহ গোলামুর রহমান কেবলাকে কোলে তুলে নেয়া, তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা, প্রথম নজরেই গাউসিয়তের ফুয়ুজাতের নহর জারি করা এ সব কিছু বেলায়তের সম্রাট প্রিয় নবীর ইলমি দরিয়ার পাক দরজা হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা জন্মাবার পরে তাঁর সাথে প্রিয় আকায়ে মুস্তফার মহান নবুয়তী মু'য়ামালাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মওলা আলী শেরে খোদা (রাদ্বি.) একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর জন্ম কা'বা ঘরে– আর শাহাদত আল্লাহর ঘর মসজিদে। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মা-বাবা এমন সন্তান জন্ম দেবে না যাঁর আগমন কা'বা ঘর বায়তুল্লাহতে আর পৃথিবী থেকে প্রস্থান স্থল আল্লাহর ঘর মসজিদ। হযরত আলী (রাদ্বি.) জন্মাবার পর জানে দু'আলম নবীয়ে মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখার পূর্বে নিজের চোখও খোলেননি বা অন্য কোন সৃষ্টির দিকে নজরও করেননি। জন্মের পর আপন চাচাত ভাইয়ের শুভ বেলাদতের কথা শুনে নবীজি তাঁকে দেখতে গেলেন এবং আপন কোলে তুলে নিলেন। প্রিয় আকার হাতের পরশ পেতেই চোখ খুললেন, নয়নভরে যিয়ারত করলেন। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীর প্রতি দয়ার নজর দিলেন আর একই নজরে তাঁকে ইলমের মহা শহরের দরওয়াজা বানিয়ে দিলেন। তাই পরবর্তীতে নবীজি বলেছিলেন "আনা মদীনাতুল ইলমে ওয়া আলীয়্যু বাবুহা" অর্থাৎ আমি হলাম ইলম এর শহর আর আলী হলো তার দরওয়াজা। প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর হযরত আলীর কাছে নবীজি তার কারণ জানতে চাইলে মওলা আলী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে থাকতেই আমি এই আরজু করেছিলাম পৃথিবীতে এসে আমি যখন চোখ খুলবো তখন আমার প্রথম নজর যেন চেহারায়ে মুস্তফার উপর পড়ে।[৩]

এই ঘটনার প্রায় ১২৬৫ বছর পরে ১৮৬৫ সনে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর মহান গাউসিয়তের বাগানে ঘটে গেল এক বেলায়তি কারিশমা। জন্মালেন হযরত কেবলার ভাতুষ্পুত্র বাবা গোলামুর রহমান। কোলে তুলে নিলেন, নজর

দিলেন এবং কালাম ফরমালেন, পয়লা নজরেই গাউসুল আ'যম বিল বিরাসত বানিয়ে দিলেন। জন্মের পর থেকে শিশুকাল বাল্যকাল যৌবন কাল কোন কালেই তাঁকে দুনিয়ার কোন মোহ মায়া আকৃষ্ট করতে পারেনি। সর্ব বিষয়ে যিনি তাঁকে আকৃষ্ট করে মায়ার জালে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি হলেন হযরত আকদছ শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

গাউসুল আ'যম বাবা ভাণ্ডারী দশ বছর বয়স হতেই নামাজ রোজা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি শরয়ী ইবাদত সম্পাদন করার পর যে কাজটি বেশী পছন্দ করতেন তা হলো হযরত কেবলার খেদমতে অবস্থান করা। জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জন করার চেয়েও তিনি হযরত কেবলার আধ্যাত্ম ইউনিভার্সিটিতে জ্ঞান অর্জন করা শ্রেষ্ঠ মনে করলেন। অপর দিকে হযরত কেবলা গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.)ও চাচ্ছিলেন তাঁর বাগানের শ্রেষ্ঠতম গোলাপ গোলামুর রহমান প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার পর্ব চুকিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাঁর অধ্যাত্মিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়ে যাক। তাই জমাতে উলা শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা দেবার অনুমতি চাইলে হযরত আকদছ বলেছিলেন, হাঁ বাছা তাহার সে এমতেহান হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে নাজিরহাটে আশরাফ খলিফার দোকানে খাইয়্যা মসজিদে থাকতে বলি," পরবর্তীতে অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলেও দু'টো পরীক্ষা দেবার পর তাঁর পক্ষে আর পরীক্ষার হলে স্থির থাকা সম্ভব হলোনা। প্রেমাস্পদের প্রেমের টানে ফিরে আসতে হলো মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে। দরবার শরীফে এসে হযরত কেবলার পদযুগল জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। হযরত কেবলা নিজ মোবারক হাতে শরবত পান করালেন। তিনি আস্তে আস্তে সুলকী হালে ফিরে আসলেন এবং সে দিন থেকে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু হযরত কেবলার খেদমত করা এবং ইবাদত রিয়াজতে মশগুল থাকা নিজের জীবনের অবলম্বন হিসেবে বেছে নিলেন, আর সে দিন থেকে কেউ তাঁকে লেখা পড়া করবার কথা বললে তিনি বলতেন–

صد کتاب در قہاد ر نار کن روئے خود را جانب دلدار کن

অর্থাৎ- শত কিতাবের পাতা আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও। নিজ চেহারা বা মনকে প্রিয়তম খোদা তায়ালার দিকে রুজু করে দাও।[৪]

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় কোটি কোটি অনুসারী অনুগামী তথা ভক্ত অনুরক্তদেরকে অবহিত করে হযরত বাবাজান কেবলা (ক.)'র শানে আযমত সম্পর্কে হযরত আকদছ (ক.) বলেছিলেন–

"তিনি জালালী শানের অধিকারী, ইয়ামেন দেশে অবস্থান করেন। আলমে আরওয়াহায় (রূহ জগতে) ছায়ের করেন।

আলোচ্য কালামে হযরত কেবলা (ক.) বাবাজান কেবলা (ক.) কে শাহজালাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বাবা ভাণ্ডারী বেশীর ভাগ সময় সুলকীর পরিবর্তে জজবা হালতে থাকতেন। তিনি ছিলেন জালালী ফয়েজের বিকাশস্থল। তাই হযরত কেবলা তাঁকে শাহ জালাল খেতাব দিয়েছিলেন। বিশ্বখ্যাত আশেকে রসুল খায়রুত তাবেয়ীন হযরত ওয়ায়েছ কুরনী (র.) সুদুর ইয়ামেন দেশ থেকে যে রুহী ফয়েজ রেছানীর ত্বরিকা চালু করেছিলেন তা ভবিষ্যতে বাবা ভাণ্ডারীর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তাই হযরত আকদছ তাঁকে ইয়ামেন দেশের অধিবাসী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাইতো যারা তাঁর কাছে মুরীদ হতে চাইতেন তিনি তাদেরকে মোরাকাবা অবস্থায় জজবা হালতে অথবা স্বপ্ন যোগে রুহী ফয়েজ দানের মাধ্যমে তাঁর মুরীদ হিসেবে কবুল করে নিতেন।[৫] হযরত কেবলা তাঁর বাগানের শ্রেষ্ঠ পরিস্ফুটিত গোলাপ বাবা ভাণ্ডারীকে আদব করবার জন্য তামাম আশেক কুলকে নির্দেশ দিলেন। তাঁকে মানার এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার মধ্যেই তোমাদের মুক্তির পথ। হযরত আকদছ (ক.) এবং বাবাজান কেবলার ওসিলায় আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. দিওয়ান-ই-আযীয (বাংলা অনুবাদ), প্রথম প্রকাশ ৭ এপ্রিল ২০০৯, পৃষ্ঠা -১২৩।

২. তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া, মাইজভাণ্ডারী একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর- ২০০৮, পৃষ্ঠা -২৫।

৩. ছহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৫২৫, ছহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৯, তিরমিজী শরীফ, ২য় খণ্ড- পৃষ্ঠা- ২১৪, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

৪. বাবাজন কেবলার জীবন চরিত শাহসূফি মাওলানা আব্দুছ ছালাম ইছাপুরী (র.), পৃষ্ঠা-২২-২৮।

৫. প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ৪৮।

৬. প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা ৫৩।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র জীবন ও কর্ম: আধ্যাত্মিকতার আলোকে

• ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •

পূর্ব প্রকাশিতের পর:

ভারত বর্ষে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার কর্ণধার হিসেবে শেখ সৈয়দ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.): ২৩ বৎসর বয়সে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)'র উত্তরাধিকার খলিফা নিযুক্ত করা হয় এবং দিল্লীতে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে সিল্‌সিলাহ্ বিকাশের কাজে আত্ম নিয়োগ করার জন্য তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ (র.)'র তরফ থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ কাজটি ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং দায়িত্বের বিষয়। রাজধানী দিল্লী থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার অনুসারীদের মধ্যে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার বিকাশ সাধন করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু যুবক নিজাম উদ্দিন (র.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সে কঠিন দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আমির খসরু (র.) বলেন, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বাবা ফরিদ (র.)'র জপমালা সংগ্রহ করে এক সুতায় গেঁথেছেন। সে জন্যই তাঁর নাম হয়েছে নিজাম (মুক্তার মালা)। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র ভারত চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার খানকাহতে ভরে যায়। ভারতের প্রতিটি আনাচে-কানাচে চিশ্‌তীয়া খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোহাম্মদ ঘোথী সত্তারী (Ghauthi Sattari)'র বর্ণনা মতে, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায় সাতশত সিনিয়র শিষ্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়মিত চিশ্‌তীয়া ত্বরিকায় বায়াত প্রদান ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর যে গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়, তা সকল মহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। গিয়াসপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) যে সিদ্ধান্ত নেন তা'ছিল ঐতিহাসিক। গিয়াসপুরে বসবাসের পর থেকেই একজন উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক গুরু ও প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ গিয়াসপুর থেকেই চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার বিকাশের ক্ষেত্রে গণজাগরণ সূচিত হয়। বলা বাহুল্য, হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পূর্বে এই সিল্‌সিলাহর কোন ওলী ত্বরিকার অনুসারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এত ব্যাপক কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বায়াত প্রদানের ক্ষেত্রে আমজনতার জন্য অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হবার পর যদি কোন শিষ্যের চরিত্রগত উন্নতি হয় এবং তার ইতোপূর্বে কৃত সকল ভুলের জন্য অনুশোচনা করে, তাহলে সে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। মানুষকে খোদার নৈকট্য লাভের পথে যাত্রা শুরুর জন্য সুযোগ দেয়া উচিৎ। কেননা তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ (র.) বলেছেন, নিজাম! যে পর্যন্ত তোমার একজন শিষ্যও বেহেশতের বাইরে থাকবে, সে পর্যন্ত আমি ফরিদ (র.) বেহেশতে প্রবেশ করবনা। তিনি চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার অনুসারী সকল শিষ্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেন। নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা কেমন ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকে জানা যাবে:-

১. মাওলানা বোরহান উদ্দিন গরীব ছিলেন হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র একজন সিনিয়র শিষ্য। তিনি দাক্ষিণাত্যে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকা প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রান্নাঘরে খাদ্য প্রস্তুতির কাজ তদারক করতেন। তিনি ছিলেন সত্তর বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ লোক। তিনি একদিন খানকাহতে ভাঁজকরা কম্বলের উপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আলী জামবেলী এবং মালিক নুশরাত (যারা এক সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির খানসামা ছিলেন) নামক হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র দুই শিষ্য শেখ নিজাম (র.) কে জানালেন যে, মাওলানা বোরহান উদ্দিন মুর্শিদের মত (বা শেখের ন্যায়) তাঁর কার্পেটে বসে আছেন। এ সংবাদে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। মাওলানা বোরহান উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র সামনে ভয়ে কোন কথাই বলতে পারলেন না। যখন মাওলানা বোরহান উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিলেন, তখন ইকবাল নামক হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র একজন খাদেম এসে তাঁকে বললেন যে অনতি বিলম্বে তিনি যেন খানকাহ্ ত্যাগ করে চলে যান। এটাই হচ্ছে শেখ নিজাম (র.)'র আদেশ। মাওলানা বোরহান উদ্দিন আঘাত পেলেন এবং ইব্রাহিম তস্‌তদরের বাসায় আশ্রয় নিলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর ইব্রাহিম তস্‌তদর ও তাঁকে তাঁর বাসা ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

শেখ নিজাম (র.)'র সুনজরে না থাকলে কারও বাসায় তিনি সাদরে গৃহীত হবেন না বলে এ দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয়। মাওলানা বোরহান উদ্দিন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর নিজ

বাড়ীতে চলে গেলেন। বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠিগণ তাঁকে সান্তনা দিতে আসলেন। কিন্তু হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র কাছে গিয়ে তাঁর জন্য সুপারিশ করার কারও সাহস হলনা। হযরত আমির খসরু (র.) বুকে সাহস নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযরত আমির খসরু (র.) ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ীটি তাঁর ঘাড়ের চারিদিকে পেঁচিয়ে বাঁধলেন যেরূপভাবে একজন আসামী আদালতে আত্মসমর্পণের সময় করে থাকে। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে মোহিত হয়ে গেলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আমির খসরু (র.) মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত আমির খসরু (র.) তাঁর মত আসামীর সাজে মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে এনে হাজির করলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁকে ক্ষমা করলেন।

বলা বাহুল্য। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শেখ নিজাম (র.) সকল শিষ্যকে জনসাধারণের সাথে কথাবার্তায় চাল চলনে অত্যন্ত বিনীত ও নিরহঙ্কার হওয়ার জন্য শিক্ষা দিলেন।

২. কাজী মুহিউদ্দিন কাসানী শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র অত্যন্ত সিনিয়র খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) যখন দেখলেন যে, সরকারী চাকুরীর প্রতি তাঁর কিছুটা আগ্রহ আছে, তিনি তাঁর থেকে খেলাফত নামা প্রত্যাহার করে নিলেন এবং এক বৎসর পর্যন্ত তাঁর খেলাফত স্থাপিত রাখলেন। এটাতে প্রমাণিত হল যে, তাঁর কোন শিষ্য বা খলিফার যদি সরকারী চাকুরীর প্রতি বিন্দু মাত্র আসক্তি বা ঝোঁক থাকে তা হলে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র বিরাগভাজন হবেন। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) যে আদর্শ অনুসরণ করতেন তা নিম্নোক্ত দু'টো নীতি থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। এ নীতিগুলো থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। নীতিদ্বয় হলো নিম্নরূপঃ

১. হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) স্রষ্টার সৃষ্টি রাশির সেবা বা ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর মুরীদদেরকে তাগিদ দিতেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদতের চাইতে মানব সেবাতে শেখ নিজাম (র.) অত্যধিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবহ বলে বিবেচনা করতেন।

২. চিশ্‌তীয়া সিল্‌সিলাহ্‌র জন্য বাবা ফরিদ (র.)'র আদর্শ অনুসরণ করা জরুরী বলে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) মনে করতেন। বাবা ফরিদ (র.) সমাজে মানব সেবা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা অনুসরণের জন্য শেখ নিজাম (র.) সবাইকে তাগিদ দিয়েছেন। শেখ নিজাম (র.) সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন। আমির-ফকির, আশরাফ-আত্‌রাফ এরূপ কোন ভেদাভেদ তাঁর কাছে ছিলনা। কারও প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ না করার জন্য তিনি জোর তাগিদ দিতেন।

বাবা ফরিদ (র.) থেকে খেলাফত লাভের পর শেখ নিজাম (র.) উপর্যুক্ত সাংগঠনিক ও আদর্শগত নীতিমালাকে অনুসরণ করেই মানবাত্মাকে আলোকিত করার আধ্যাত্মিক কর্মসূচী শুরু করেন।

শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌ জীবনঃ হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র খানকাহ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মুক্ত ও স্নিগ্ধ বাতাসে ভরপুর ছিল এ খানকাহ। প্রথমে এ খানকাহটি ছিল একটি মাটির গুদাম। কিন্তু পরবর্তী কালে মালিক ইমাদ উল মুলকের একজন কেরানী জনাব জিয়াউদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতিক্রমে খানকাহ্‌ গৃহটি পাকা করে দেন। বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধির পাশে এ খানকাহ গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। খানকাহ ভবনের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় হল ঘর ছিল এবং এ হল ঘরটির উভয় পাশে অনেকগুলো সারি সারি স্তম্ভ ছিল। খানকাহ্‌ প্রাঙ্গণে কেন্দ্রস্থল থেকে কিছুটা দূরে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল যার শাখা-প্রশাখা ভবনের ছাদের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ছিল খানকাহ্‌র বারান্দা। সিনিয়র শিষ্যদের বসার জন্য বড় হলটির সাথে সংযুক্ত বারান্দার কিছু অংশ দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। প্রধান ফটকের বিপরীতে একটি ফটক-কক্ষ (Gate room)ছিল যার উভয় পাশে ছিল দরজা। এটা একটা বড় কক্ষ ছিল এবং অন্যদের প্রবেশ পথ বন্ধ না করে এ কক্ষে স্বল্পসংখ্যক লোক আরামে বসতে পারত। এ কক্ষের সাথে সংলগ্ন ছিল রান্নাঘর। পরবর্তী সময়ে শেখ নিজাম (র.) এ হল ঘরের ছাদে ছোট্ট একটি কাঠের দেয়াল ঘেরা কক্ষে বাস করতেন। দিনের বেলায় তিনি প্রধান ভবনের ছোট কামরায় একটিতে বিশ্রাম নিতেন। ছাদের চারিদিকে নীচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা ছিল এবং আঙ্গিনার দিকে এ দেয়ালটি উঁচু করে দেয়া হয়েছিল যাতে শেখ নিজাম (র.)'র কামরার উপরে সকাল বেলায় ছাদে ছায়া থাকে। এ কক্ষে শেখ নিজাম (র.) দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। খানকাহর সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছাদের উপর থেকে খানকাহর কর্মকাণ্ড তদারকি করতে ভুলতেন না। তাঁর কথাই ছিল আইন এবং এ আইন থেকে বিচ্যুতি ছিল অকল্পনীয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হোত। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র কাছে রাজা ও ভিক্ষুকের মধ্যে কোন তফাৎ ছিলনা।

দর্শনার্থীদের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করার জন্য তিনি খানকাহর লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন। ঈদুল আজহার পরবর্তী তিনদিন খানকাহতে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হতো। বৈষম্যহীন ও বিরামহীনভাবে দর্শনার্থীদেরকে খাবার পরিবেশন করা হতো। একদা হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) এক দরবেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত তাঁর ভাল লাগে? দরবেশ উত্তর দিয়েছিলেন, সর্বদা-খাবার কথা যে আয়াতে বলা হয়েছে।' (১৩:৩৫)। কোন দর্শনার্থীকে রোদের মধ্যে আঙ্গিনায় বসে থাকতে দেখলে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বলতেন তারা রোদে বসে আছে অথচ আমি তাপে পুড়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না।

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বলতেন, কোন গরীব দর্শনার্থী যখন খালি হাতে আমার দরবারে আসে, তাকে কিছু উপহার দেয়া আমার কর্তব্য হয়ে যায়। তাঁর পায়ে ব্যথা থাকার কারণে একদা তিনি খাটে বসেছিলেন। এজন্য তিনি দর্শনার্থীদের কাছে মাফ চেয়ে নিলেন।

একবার শেখ রোকন উদ্দিন আবুল ফতেহ দোলনা বা পাল্কী করে খানকাহতে এসেছিলেন। পায়ে সমস্যা থাকার কারণে তিনি পাল্কী থেকে নামতে পারছিলেন না। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে তাঁকে সাহায্য করতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে পাল্কী থেকে নামতে বারণ করলেন এবং নিজে স্বয়ং হল ঘরের মেঝেতে বসে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

শেখ বোরহান উদ্দিন গরীব মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদী সৈয়দ খামোশ কিরমানী, মাওলানা মিরাজী, আমির খুরদ প্রমুখ বিখ্যাত শিষ্যগণ স্থায়ীভাবে খানকাহতে বসবাস করতেন। কোন কোন সময় ভ্রাম্যমান বিশ থেকে ত্রিশজন দরবেশ একসাথে খানকায় রাত্রি যাপন করতেন। কোন কোন বিখ্যাত খলিফাগণ বাদ্যযন্ত্র ও ছোট বাদকদলসহ খানকায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন। একদা মুলতানের শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার শিষ্য খাজা মাহমুদ গজরুনী খানকায় আসলেন। রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে পাশে যমুনা নদীতে গেলেন। এমন সময় জনৈক চোর তাঁর জামাটি নিয়ে পালাল। জনাব গজরুনী এসে চিৎকার করতে লাগলেন। তখন হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রার্থনায় রত ছিলেন। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে এ আশঙ্কায় শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগ দেহলী জনাব গজরুনীকে নিজের জামাটি দিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে শেখ নিজাম (র.) ঘটনাটি জানতে পেরে নিজের গায়ের জামাটি জনাব নাছির উদ্দিন চেরাগকে দিয়ে দিলেন। আর একদিন মাওলানা ওয়াজি উদ্দিন পাইলীর জুতাগুলো খানকাহ থেকে হারিয়ে গেলে শেখ নিজাম (র.) নিজের জুতাগুলো তাঁকে দিয়ে দিলেন। জনাব পাইলী জুতাগুলো মাথায় করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এটা আমার মাথার মুকুট। শেখ নিজাম (র.)'র একটি কাশ্মীরী শাল ছিল যা অনেক দর্শনার্থী ব্যবহার করতেন। প্রকৃত পক্ষে খানকাহ ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা ও তরিকা চর্চার এক অনুপম প্রাণ কেন্দ্র।

শেখ নিজাম (র.) শিষ্যদের সাধনার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ছোট ছোট দলে তাদেরকে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের জন্য একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিতেন। প্রাথমিক স্তরের শিষ্যদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক, মাধ্যমিক স্তরের জন্য আর একটু বেশী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং উচ্চ স্তরের জন্য বেশ সিনিয়র প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ বা তালিম দেয়ার দায়িত্ব দিতেন। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, ধর্মীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেত এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করত। শেখ নিজাম (র.) উপদেশের চাইতে উদাহরণের মাধ্যমে পাঠদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। দর্শনার্থীরা যখন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আসতেন, তখন তিনি উদাহরণের মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান দিতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দু'একটা দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বললেন, "শেখ আলী নামক এক লোক তার পা দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে বসে কাপড় সেলাই করছিলেন। এমন সময় তাঁর দেশের বাদশাহ ঝটিকা সফরে বের হলেন। বাদশাহর আগে উজির এসে শেখ আলীকে পা গুটিয়ে নিয়ে বাদশাহকে সম্মান দেখাতে বললেন। লোকটি কর্ণপাত করলনা। বাদশাহ যখন তথায় পৌছলেন তখন লোকটি উজিরের হাতটি বগলে নিয়ে বললেন, আমি কোন অনুগ্রহের জন্য হাত পাতিনা। তাই আমি আমার পা প্রাসারিত করতে সক্ষম হয়েছি।"

এ উদাহরণের মাধ্যমে এ শিক্ষাই দেয়া হল যে কারও কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা শ্রেয়।

শেখ নিজাম (র.) বর্ণনা করেন, "শেখ হাসান আফগান শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার শিষ্য ছিলেন। তিনি বাজারে থাকা অবস্থায় আজান শুনতে পেলেন এবং নামাজ পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করে নামাজ পড়লেন। জামাত সহকারে নামাজ পড়ার পর তিনি ইমাম সহেবের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আপনি যখন নামাজ পড়াচ্ছিলেন, আমি তখন আপনার সাথে ছিলাম। আপনি তখন এখান থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে আপনি কয়েকজন ক্রীতদাস কিনেছিলেন। তারপর আপনি মুলতানে ফিরে আসলেন। অতঃপর আপনি ঐ ক্রীতদাসগুলো নিয়ে খোরাশান গেলেন। আমিও আপনার সাথে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আপনি আমাকে কোথায় ফেলে এলেন?"

(চলবে)

আহলে বায়তে রাসূল ঃ প্রসঙ্গ পবিত্রতা

• মুহাম্মদ রবিউল আলম •

আল্লাহ তায়ালা আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অপবিত্রতা দূর করে তাঁদেরকে পবিত্র করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'[১] এ আয়াত শরিফে আল্লাহ তায়ালা আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্রতার কথা তুলে ধরেছেন। আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে ইসলাম আজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই তাঁদের সম্পর্কে জানা আমাদের উচিত।

আহলে বায়তের পরিচয়: প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলূসি আলাইহির রাহমাহু বলেন, 'হানাফি মাযহাব মতে, আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হাশিমি বংশের সকল ঈমানদার নারী-পুরুষকে বুঝানো হয়।'[২] তবে আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহর সন্তানগণ, হযরত আলী (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) এবং উম্মুহাতুল মু'মিনিনসহ তাঁদের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়।[৩]

আহলে বায়তের পবিত্রতা: আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত। তাঁদের পবিত্রতার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 'হে নবি-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'[৪] এ আয়াতখানা অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে কয়েকটি প্রেক্ষাপট বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো: ১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-'এ আয়াত শরিফ পাঁচজন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা হলেন, আমি, হযরত আলি, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।[৫] ২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং হযরত ইকরামাহু রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বলেন, এটি উম্মুহাতুল মু'মিনিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[৬] ৩. হযরত উম্মে সালমাহু রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শয়নের স্থানে খায়বারি চাদর গায়ে দিয়ে আরাম ফরমাচ্ছেন। অতঃপর হযরত ফাতিমাহু রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্যে বিশেষ খাবার-ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসলেন। এটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,হে ফাতিমাহু! তুমি তোমার স্বামী এবং সন্তানদ্বয় হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমকে ডেকে নিয়ে আসো। তিনি তাঁদেরকে ডেকে আনলেন আর তাঁরা খাবার গ্রহণ করলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াত শরিফ অবতীর্ণ করেন। এ আয়াত শরিফ অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমকে তাঁর চাদর দ্বারা আবৃত করে ফেললেন। তারপর তিনি চাদরের ভিতর থেকে হাত মুবারক বের করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আল্লাহ! এরাই হলেন আমার আহলে বায়ত এবং আপনজন। আপনি তাঁদের অপবিত্রতা দূর করুন আর তাঁদেরকে পবিত্র করুন।' এ দুয়া তিনি তিনবার করেছেন।[৭] হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, কোন একদিন সকালে কালো পশমের নকশী করা একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন। তাঁর নিকট হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আসলেন আর তিনি তাঁকে চাদরে প্রবেশ করালেন। তারপর হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আসলেন আর তিনি তাঁকে তাঁর চাদরে প্রবেশ করালেন। তারপর হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আসলেন আর তিনি তাঁকে চাদরে প্রবেশ করালেন। পরিশেষে হযরত আলি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আসলেন আর তিনি তাঁকেও চাদরে প্রবেশ করালেন এবং ইরশাদ করেছেন- 'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'[৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান আর তাঁদেরকে পবিত্র করতে চান। অপবিত্রতা কী আর তাঁদেরকে পবিত্র করার অর্থ কী- এ নিয়ে মুফাসসিরগণ কতিপয় মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুমা বলেন, নাপাকী বা অপবিত্রতা অর্থ শয়তানের প্ররোচণায় করা হয়, এমন কাজ এবং যে কাজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কোন সন্তুষ্টি নেই। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ যে কোন মন্দ কাজ।[৯] কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ শিরক,কৃপণতা,লোভ-লালসা,কু-প্রবৃত্তির প্ররোচণা ইত্যাদি। আল্লামা আলূসি আলাইহির রাহমাহ্ বলেন, এখানে রূপকার্থে পাপকে বুঝানো হয়েছে।[১০] আল্লামা আলূসি আলাইহির রাহমাহ্ বলেন, আল্লাহ তাঁদেরকে পরহিজগার বানাতে চান।[১১] উল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- আল্লাহ তো চান তাঁদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য পাপ থেকে মুক্ত করতে আর পাপ থেকে মুক্ত করে পুতঃপবিত্র করতে। মহান রাব্বুল আলামিন যা ইচ্ছা করেন,তা-ই করেন-এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেন- [১২] اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

'নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন,তা-ই করেন।' এতে প্রমাণিত হয় যে, আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন পবিত্র।

(পাদটীকা)

১.সূরা আহযাবঃ আয়াত নং ৩৩।
২.আলূসী,রুহুল মায়ানী,(বৈরুত ঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ,১ম সংস্করণ,১৪১৫ হি,),খ.১১,পৃ.১৯৪।
৩ .ইমাম রাজি,মাফাতিহুল গায়ব,(বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,১ম সংস্করণ,১৪২১ হি,),খ.২৫,পৃ.১২১।
৪ .প্রাগুক্ত।
৫ .আলূসী, প্রাগুক্ত,খ.১১,পৃ.১৯৭।
৬ .প্রাগুক্ত,খ.১১,পৃ.১৯৪।
৭ .ইবন কসীর,তাফসীরুল কুরআনি আজিম, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর,নতুন সংস্করণ,১৪১৪ হি,), খ.৩,পৃ.৫৮৫; সুয়ূতী,আদ্ দুররুল মানছুর,(বৈরুত ঃ দারুল ফিকর),খ.৬,পৃ.৬০৩।
৮.ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, (বৈরুত ঃ দারুল জিয়াল), খ.৭,পৃ.১৩০।
৯.ইমাম খাযিন, লুবাবুত তাবিল, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর), খ.৫,পৃ.২৫৯।
১০.আলূসী, প্রাগুক্ত, খ.১১.পৃ.১৯৩।
১১ .প্রাগুক্ত।
১২ .সূরা হুদ ঃ ১০৭।

সূফি উদ্ধৃতি

■ তিনটি কাজ মানুষের বড় বিপদ ডেকে আনে, যথাঃ ১. সম্পদের লোভ, ২. মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা এবং ৩. সবার নিকট গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় হওয়ার বাসনা।

■ পার্থিব আমোদ উৎসব আল্লাহকে খুশী রাখার চিন্তাকে মন থেকে দূর করে দেয়।

■ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ভয় ও তাঁর রহমতের আশা অন্তরে বিরাজমান থাকাই ঈমানের লক্ষণ।

– হযরত আবু ওসমান হীরী (রাহ্)

■ তোমাদের উচিত সাধারণ বিছানায় শয়ন করা ও আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা।

■ আরিফদের কাছে এক বিশেষ আয়না রয়েছে যখন তিনি তার দিকে নজর করেন তখন তাতে আল্লাহ তা'আলা এসে দেখা দেন।

■ খুশী ও আনন্দিত মনে আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নেয়াই হয় রেঘা।

■ যে আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে ভয় না করে সে-ই হল খোদাভীরু।

– হযরত আবু মুহাম্মদ রুইয়াম (রাহ্)

মাইজভাণ্ডার শরীফে সত্যের সন্ধান

• এস. এম. জাফর ছাদেক আল্ আহাদী •

পূর্ব ধারাবাহিকতায়:

বিরোধিতা বিলোপোত্তর মেনে লওয়া: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ত্বরীক্বা-দর্শনের বিরোধিতা পরিহার করতঃ অনুসারী না হলেও যথাযথ মান্যকারী হয়ে সৌভাগ্যবান হওয়ার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত- গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল্ ক্বাদেরী (রহ.)। তাঁর জীবনী গ্রন্থ এবং দিওয়ানে আযীয যথাযথভাবে যাচাই যোগে পাঠ-পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)কে তিনি কীরূপ মান্য করতেন এবং তা যোগে কী সৌভাগ্য তাঁর অর্জিত হয়েছে! তদুপরি হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)'র জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের তথ্য-তত্ত্বেও যে, গাযীয়ে মিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র সাফল্যগাথা আমাদের মত সাধারণের অলক্ষ্যে বিরচিত হয়েছিলো, তা সত্যিই চমকপ্রদ!

'হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থ লেখক: মৌলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া (গোল্ড মেডালিষ্ট) সীতাকুন্ড, ষষ্ঠ প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং, ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে- "হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুকাল পূর্বে একদা ছায়ের করিতে করিতে হজরত আকদাছ হাটহাজারী উপস্থিত হন। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিকটবর্তীস্থানে পৌঁছিয়াই বলিতে লাগিলেন, 'এহাঁ কোরান আওর হাদিছ কি বো নেকাল রাহী হ্যায়' (অর্থাৎ: এখানে কুরআন-হাদীসের সুগন্ধি বের হচ্ছে)।" অতঃপর তিনি উক্ত স্থানের চতুপার্শ্বে হাঁটিয়া উহার সীমা নির্ধারণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার এই পবিত্র ভবিষ্যত বার্তার রহস্য ও তাঁহার আচরণের সারমর্ম কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বহুকাল পর উক্তস্থানে ঐ নির্ধারিত সীমাতেই হাটহাজারী মাদ্রাসার পত্তন হয়। তখনই উপস্থিত লোকগণ তাঁহার পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও স্থান নির্দেশের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। হজরত যে অসাধারণ কশ্‌ফ কেরামত শক্তি রাখিতেন, উহা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইলেন। তাই 'নাদওয়াতুল মোকাল্লেফিন' নামক কেতাবের চতুর্থ খন্ডে মৌলানা নজির আহমদ ছাহেব হজরতের কশ্‌ফ কেরামত সম্পর্কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

উপরোক্ত ঘটনালোকে পর্যালোচনার বিষয় হল- উক্ত মাদ্রাসার সূচনাত্তোর কিছুকাল তথায় সুন্নী আক্বীদার আলেমগণ শিক্ষকতায় জড়িত থাকলেও সে ইতিহাস বিস্মৃত-বিলুপ্ত। সেখানে অধ্যয়নোত্তর বের হওয়া সুন্নী মতাবলম্বীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন ছাড়া তেমন খ্যাতিসম্পন্ন কাউকে দেখা যায় না। এমতাবস্থায় সর্ব সাধারণের জ্ঞাতানুসারে মাদ্রাসাটি আগাগোড়া ওহাবী পন্থীদের বলেই খ্যাত ও পরিচিহ্নিত। অতএব 'কুরআন-হাদীসের সুগন্ধি বের হচ্ছে' মর্মে পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীর সুবিখ্যাত ও একমাত্র বাস্তবতাই হচ্ছে- উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নোত্তর বের হয়ে সুন্নিয়তের সুবিশাল খিদ্‌মাত আঞ্জাম দানে সাড়া জাগানো সফল, অবিস্মরণীয় সিপাহ্‌সালার ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল্ ক্বাদেরী (রহ.)।

গাযীয়ে দ্বীনো মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের কথা বিশিষ্ট জন থেকে সর্বসাধারণ সকলেরই জানা বিষয়। কিন্তু উক্ত সাফল্যের উৎসমূল বা রহস্যপূর্ণ হাক্বিকত অনেকেরই অজানা, কিংবা জানা সত্ত্বেও যথার্থরূপ উপলব্ধি করতে খুব কম সংখ্যকই সক্ষম। অথচ ঘটনাক্রমে সে উৎসমূলের কথা, তিনি নিজেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন!

তাঁর জীবনী গ্রন্থ- রচনায়: ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী, ১৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে- "হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) এর সর্বাধিক সংস্পর্শপ্রাপ্ত মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) একবার এক ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে আগমন করেছিলেন। মাহফিল শেষে তিনি গাড়িতে করে বাড়ী অভিমুখে ফিরছিলেন। আমি অধম হুজুরের সফরসঙ্গী হিসাবে গাড়িতে ছিলাম, গাড়ি যখন ফটিকছড়ি রোড ধরে মাইজভাণ্ডার শরীফ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ ঘটনাক্রমে আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমাদের গাড়িকে

অনুসরণ করছে। এরূপ তেজোদীপ্ত আলোকছটা দর্শন করে আমরা সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। হুজুরকে তার রহস্য ও হাক্বীকত জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর করলেন, 'এটা গাউসুল আজম হযরত কেবলা (রাঃ) এর পক্ষ থেকে আমি অধমের প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত। যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে।' নাজিরহাট পৌঁছা অবধি আমরা এই আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অতঃপর এই আলোকছটা অদৃশ্য হয়ে যায়।"

ঘটনা প্রবাহে উক্ত তেজোদীপ্ত আলোকছটা কিছুসময়ের জন্য দৃশ্যমান হয়ে অদৃশ্য হলেও সে অদৃশ্য শক্তিই যে, ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বিনোমিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের অন্তরালে সার্বক্ষণিকের মূল উৎস, তা এখানে সুস্পষ্ট। গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা (রাদ্বি.)'র বিশেষ নজর করম ও রহমতই হচ্ছে সে অদৃশ্য শক্তি, যা গাযীয়ে মিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) কে সর্বদা আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে। অতএব গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের উৎসমূল হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরই অভিব্যক্তি আরেকবার স্মরণ করি– "এটা গাউছুল আজম হযরত কেবলা (রা.) এর পক্ষ থেকে আমি অধমের প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত। যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে।"

ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশাল তরণীর কাণ্ডারী হয়ে তিনি নিরাপদে পাড়ি জমাতে সর্বাঙ্গীন সফল হন। সর্বস্তরের সুন্নী জনতার মাঝে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন প্রাণবন্ত জাগরণ। ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন – দলবলসহ বাতিলের সব দস্যিনৌকা। অদ্যাবধি তাঁর গুণগান সকলের মুখে মুখে অন্তরে অন্তরে প্রবহমান।

তাঁর সময়কালে বলতে গেলে তিনি একার দ্বারা সুন্নিয়তের যে সুবিশাল বিজয় সম্পাদিত হয়েছিল, তার হাজার-লক্ষ ভাগের এক ভাগও পরবর্তীদের দ্বারা হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ বহু সুন্নী প্রতিষ্ঠান সহ বিজ্ঞ অনেক ওলামায়ে কিরামের বিদ্যমানতা অব্যাহত। উত্তরসূরীদের ব্যর্থতা খুঁজতে গেলে একে অপরের উপর দোষ চাপানোর কিছু চেষ্টা করতঃ হাত গুটিয়ে বসে থাকাই সার হয় মাত্র।

হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র আদর্শের এক বিশেষ দর্পণ 'দিওয়ানে আযীয'– এ দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সুন্নী জনতা কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক মান্য কোন ওলীয়ুল্লাহর পর্যন্ত উচ্চ প্রশংসাই তিনি অকপট করে গেছেন। অথচ উত্তরসূরীদের কর্তৃক কী হচ্ছে তা আঙ্গুল নির্দেশ করে দেখিয়ে না দিলেও চলে!

অনুরূপ সুন্নী ওলামা-মাশায়েখগণের প্রশংসাই তিনি করে গেছেন তদীয় লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে; অথচ উত্তরসূরীদের দ্বারা কী করা হচ্ছে তা অনুল্লেখ্য। শুনেছি, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কোন এলাকায় ওয়ায মাহফিল করতে গিয়ে এলাকাবাসী তেমন মান্য করেনা এমন সুন্নী আলেমেরও উচ্চ প্রশংসা করতঃ প্রকৃত পক্ষে সুন্নিয়তকেই শক্তিশালী করে তুলতেন। আর বড়কে তো খাটো করে দেখানো আদৌ নয়।

গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র অভিব্যক্তি হচ্ছে– হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)'র প্রশংসা তাঁর সাধ্যাতীত। 'দিওয়ানে আযীয' গ্রন্থে ক্ষুদ্র পরিসরে সুবিশাল অর্থবহ প্রশংসা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। অথচ দিওয়ানে আযীযস্থ সে সুবর্ণবক্তব্যটুকুর ন্যায্য অর্থানুবাদ না করে অন্যায্য অর্থানুবাদ করতে পারলেই যেন কোন কোন উত্তরসূরীর মন ভরে! তবে এক্ষেত্রে সংশোধনী আনার মানসিকতা যাঁদের রয়েছে, তাঁরা 'মুক্তিধারা' ১০ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী ২০১১ খ্রি. সংখ্যা দেখে নিতে পারেন। উক্ত প্রকাশনাস্থ বিস্তারিত আলোচনা এখানে তুলে ধরার সুযোগ নেই বিধায় শুধুমাত্র 'ন্যায্য অনুবাদ অংশটুকু একান্ত জরুরী টীকা সহ' তুলে ধরা হচ্ছে।

ন্যায্য অনুবাদঃ (শিরোনাম)"কুত্বে আলম, গাউসুল আ'যম, পাকিস্তান রাজাধিরাজ, খোদার পরিচয় লাভকারী আরিফ-ওলীয়ুল্লাহগণের ক্বা'বা, কাশ্‌ফ ও কারামাতের ভাণ্ডার, সমূহ ফয়য্ বা কল্যাণধারার উৎস, কামালাতের (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা সমূহের) উৎসস্থল, উঁচু মর্যাদাসমূহের মালিক হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ উল্লাহ আল্ ক্বাদেরী মাইজভাণ্ডারী চাটগামী আলাইহি রাহমতু রাব্বিহিল বা-রী'র প্রশংসায়।"

(টীকাঃ তিনি শুধু পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যই গাউসুল আ'যম হন মর্মে যথার্থ স্বীকৃত অভিমতটি হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃকও সমর্থিত প্রতিভাত হয়– এখানে 'কুত্বে আলম-গাউসুল আ'যম' পদবী-অভিধার উল্লেখ সূত্রেও।)

(১ম পঙক্তি)- "পাকিস্তানের ওই রাজাধিরাজের জন্য অজস্র হাজার প্রশংসাবাদ; যিনি আমাদের খাজা (মনিব-অধিপতি-অভিভাবক), যাঁর নাম (হযরত) আহমদ উল্লাহ, অভিধা

গাউসুল আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), তাঁরই নিমিত্তে প্রশংসাবাদ।"

(২য় পঙক্তি)– "তাঁর এ (গাউসুল আ'যম) উপাধি শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবার থেকে এসেছে এমন সুসংবাদ আউলিয়া-ই কিরামের মুখে (আলোচনায়) শুনা গিয়েছে।"

(টীকা: প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, প্রশংসিত হযরত ক্বিবলার উপাধি 'গাউসুল আ'যম' হওয়া, সে উপাধি শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া এবং তদ্বিষয়ক সুসংবাদ আউলিয়া-ই কিরামের মাধ্যমে হযরত শেরে বাংলা (রহ.) জ্ঞাত হওয়া এখানে সুপ্রমাণিত। অতএব হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে তাঁকে পূর্বাঞ্চলের গাউসুল আ'যম মর্মে 'গাউসুল আ'যম মাশরেকী' বলা এবং উপাধিটি শেরে বাংলা হুজুর কিংবা গাউসুল আ'যম জীলানীরই প্রদত্ত বলে অলীক দাবী ও উদ্ভট গল্প (গাউসুল আ'যম জীলানী (র.)'র সংস্কার ও তরিকা; ইত্যাদি) সুস্পষ্ট সত্যের অপলাপ এবং হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র উপর জঘন্য অপবাদ বৈকি!)

(৩য় পঙক্তি)– "তাঁর আবির্ভাবের কারণে বাংলা মুলুক (বাংলা ভাষাভাষীদের আবাসভূমি) পরিপূর্ণ আলোকিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রশংসার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?"

(টীকা: 'তাঁর প্রশংসার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?' উক্তিটি প্রসঙ্গত: বিশেষ লক্ষণীয়। প্রশংসিত হযরত ক্বিবলার প্রশংসা করে শেষ করা বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশংসা, গ্রন্থকার মহোদয় কর্তৃক কোনকালেই সম্ভব নয় এমন অভিব্যক্তিই এখানে প্রতিভাত হয়। অতএব হযরত ক্বিবলার যেরূপ প্রশংসা হযরত শেরে বাংলা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মূলতঃ তিনি উহারও বহু উর্ধ্বে।)

(৪র্থ পঙক্তি)– "ওহে আমার মা'বুদ! তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উসিলায় এ প্রার্থনা ক্বুবুল করুন!"

(৫ম পঙক্তি)– "হযরত শাহ্ আহমদুল্লাহ্ ক্বাদেরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী কুত্বুল্ আক্বতাব।"

(টীকা: (১) প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, 'ক্বাদেরী' শব্দের যথার্থ মর্ম উপলব্ধিতে ব্যর্থ কতিপয় লোক মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বার স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, ত্বরীক্বতের সিলসিলাগত পূর্বধারাবাহিকতায় হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী (রাদ্বি.), জুনাঈদী-সক্তী হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে একটি স্বতন্ত্র ত্বরীক্বা প্রতিষ্ঠা করেন, অনুরূপ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীও (রাদ্বি.) পূর্বধারাবাহিকতায় সুহরওয়ার্দী-ক্বাদেরী হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র একটি ত্বরীক্বা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(২) তাসাওউফের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অবগত যে, কোন শহর, দেশ বা অঞ্চলের কুত্বের পদবী 'কুত্বুল আক্বতাব' নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের কুত্বের 'কুত্বে আলম'কেই কুত্বুল আক্বতাব বলা হয়। আর 'কুত্বুল আক্বতাবে বেলাদে মাশরিক্বী' অর্থ 'পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী 'কুত্বুল আক্বতাব'ই হবে; পূর্বাঞ্চলের কুত্বুল্ আক্বতাব আদৌ নয়! কেননা 'বেলাদ' অর্থে শহর-নগর-গ্রামাঞ্চল তথা এককথায় অঞ্চলই বুঝায় (কিশওয়ারী); এবং মাশ্‌রিক্ব অর্থ যে, 'পূর্ব' তা ভাষাজ্ঞানী মাত্রই অবগত; আর এতদাঞ্চল সম্পৃক্ততায় ব্যক্তি-সত্তার পরিচিতি জ্ঞাপনীয় 'ইয়া' বা 'ইয়ায়ে নিস্‌বাতী'র অর্থ অধিবাসীই তো হয়। যেমন গাউসে বাগদাদী বলতে বাগদাদ শহরের গাউস না বুঝিয়ে বাগদাদের অধিবাসী গাউস বুঝায় এবং 'রাসূলে আরবী' বলতে আরব দেশের জন্যই মাত্র রাসূল না বুঝিয়ে 'আরবের অধিবাসী (সমগ্র জগতের) রাসূল বুঝায়; তদ্রুপ 'কুত্বুল আক্বতাবে বেলাদে মাশরিক্বী' বলতেও পূর্বাঞ্চলের কুত্বুল আক্বতাব না বুঝিয়ে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী (সমগ্র জগতের) কুত্বুল আক্বতাব' বুঝানোই বিধেয়।)

(৬ষ্ঠ পঙক্তি)– "ওই মাইজভাণ্ডার শরীফের অধিবাসী রাজাধিরাজ গাউসুল আ'যমই; তিনি হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মতগণের আলোকবর্তিকা।"

(টীকা: যারা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)কে হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে 'পূর্বাঞ্চলের জন্যই গাউসুল আ'যম' আখ্যা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তাদের বিপক্ষে এখানে স্পষ্ট অভিমত প্রতিভাত হয় যে, 'হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মতগণের আলোক বর্তিকা' মর্মেও তিনি সমগ্র জগতের গাউসুল আ'যম।)

(৭ম পঙক্তি)- "তাঁর ছায়া, 'হুমা' (যার ছায়াতলে এলে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব পাওয়া যায়, এমন) পাখির ছায়া স্বরূপ জানবে। জগতকুলে তিনি হন, (যদ্বারা পরশমণি তৈরী হয় এমন) লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল।"

(টীকা: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)'র ছায়াতলে এসে ঐশ্বর্য-রাজত্ব লাভের বিষয় সর্বজন বিদিত বাস্তবতা। আর বাস্তবিকই তিনি উল্লেখিতরূপ লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল হন বিধায় তাঁর সান্নিধ্যে ও ত্বরীক্বায়

পরশমণিতুল্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন বহু ওলীয়ুল্লাহ সৃষ্টি হওয়ার ধারা অব্যাহত।)

(৮ম পঙক্তি) -"পয়গাম্বরকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র হাতে (পরস্পর সমকক্ষ ও স্বতন্ত্র অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের জন্য) দু'টি তাজ বা মুকুট ছিলো; তন্মধ্যকার একটি নিঃসন্দেহে হযরত শাহ্ আহমদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র শির মুবারকে স্থাপিত।"

(টীকা: দু'টি তাজ বা মুকুট মর্মে ক্ষমতা ও মর্যাদার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের সমাধিকারী দু'ভাবধারার অনধিক দুই স্বতন্ত্র গাউসুল আ'যমের বিশেষত্ব প্রতিভাত হয়। যা হযরত গাউসুল আ'যম দ্বয়ের প্রথমজন ইঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়জন খোলাখুলিই ঘোষণা করেন। যথা – প্রথমজনের ইরশাদ সূত্রে নিজ সমকক্ষ একজন বন্ধুর কথা এমন বৈশিষ্ট্য সহকারে উল্লেখ করেন, যাতে নিজের এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)'র উক্তরূপ অনন্য বিশেষত্ব প্রতিভাত হয়। (বাহজাতুল আসরার, বৈরুত, লেবানন: ৫৫ পৃষ্ঠার বিবৃতি মর্মে)। আর অনন্য অপর গাউসুল আ'যমের ইরশাদ হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত মুবারকে দু'টি তাজ বর্ণনান্তরে টুপী ছিল; একটি আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরান পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়। (জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ, বেলায়তে মোতলাকা সহ বহুল তথ্য সূত্রে বর্ণিত)।

অতএব সার্বজনীন স্বীকৃত এ মহান দুই গাউসুল আ'যমের ঐক্যমত ভিত্তিক অভিমতের সাথে সাংঘর্ষিক মতভিন্নতা তথা গাউসুল আ'যমের সংখ্যা দু'য়ের কম কিংবা বেশী বলা হয় এমন মতভিন্নতা মাত্রই পরিত্যাজ্য।

এখানে উল্লেখিত 'তাজ' প্রদত্ত হওয়ার বিষয়টি যে, গাউসুল আ'যমিয়্যত ও গাউসুল আ'যমের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ মর্মীয় বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত, তা পরবর্তী পঙক্তি যোগে আরো সুস্পষ্ট।

(৯ম পঙক্তি)–"এই (তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার) কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম। পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাঁর রওযাহ শরীফ থেকে জিন-পরী ও মানবজাতি ফয়য্-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় (বিধায় তিনি গাউসুল আ'যম; গাউসুস্ সাক্বলাইন)।"

(টীকা: (১) এখানে গ্রন্থকার মহোদয়ের ভাষায়– "যী-সবব উ-গাউসুল আ'যম" অর্থাৎ 'এ (তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার) কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম" কথাটি পরিপূর্ণ একটি বাক্যই বটে। এটির সাথে পরবর্তী বাক্যের একটি অংশ তথা 'দর বেলা-দে মাশ্‌রিক্বী- অর্থাৎ 'পূর্বাঞ্চল-এ' কথাটি বিধিবহির্ভূত ভাবে যুক্ত করার প্রয়াসে যারা 'দর' শব্দের অর্থ '-এ' বা 'মধ্যে' না করত: 'জন্য' করে থাকে, তারা চোরাবালির ভ্রমে নির্ঘাত নিমজ্জিত বৈকি!

পক্ষান্তরে 'দর বেলা-দে মাশ্‌রিক্বী-' (পূর্বাঞ্চল-এ) বাক্যাংশটি তাঁর রওযাহ্'র অবস্থান নির্দেশকরণাত্মকই এবং এটির সংযুক্তি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে নয়, বরং পরবর্তী বাক্যের অন্তর্গত 'রওযাহ্ আশ্' (তাঁর রওযাহ্) বাক্যাংশের সাথেই। আর 'বেলা-দে মাশ্‌রিক্বী–'র অর্থ এখানকার ক্ষেত্রানুসারে 'পূর্বাঞ্চল'ই হবে; যেমনটি স্বাধীনতা পূর্বকালে 'মাশ্‌রিক্বী-পাকিস্তা-ন' বা 'পাকিস্তা-নে মাশ্‌রিক্বী-'র অর্থ 'পূর্ব পাকিস্তান' বুঝানো হত। কারণ ব্যক্তি সত্তা বিহীন কেবলমাত্র স্থানের সাথে সম্পৃক্ততা জ্ঞাপনীয় 'ইয়া' যুক্ত হলে এমন অর্থই বিধেয়।

আর 'জিন-পরী ও মানবজাতি ফয়য্-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয়' উক্তি মর্মে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) অবিকল হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী-বাগদাদী (রাদ্বি.)'র মতো গাউসুস্ সাক্বালাঈন'ও হন। অতএব সর্বসাকুল্যে আমাদের উপরোক্তরূপ অনুবাদই যথার্থ।

(২) এতে করে যে দু'টি তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার কারণে অনধিক দুই গাউসুল আ'যম সাব্যস্ত হন, তদ্ব্যতীত অন্য কাউকে গাউসুল আ'যম বলতে গেলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক! তাহলে স্বয়ং হযরত শেরে বাংলা (রহ.)ও এ দু'সত্তা ব্যতীত অন্যান্যদেরকে 'গাউসুল আ'যম' লিখার কারণ কী?

অতএব কারণ খুঁজে সমন্বয় করতে গেলে আমাদের বোধবুদ্ধিতে যেটুকু আয়ত্বে আসে তা নিম্নরূপ।

ক. হযরত কুত্বুল আক্বতাব বাবা ভাণ্ডারী (রাদ্বি.)কে তিনি 'ছানী' বা দ্বিতীয় গাউসুল আ'যম বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ ছানী বা দ্বিতীয় কথাটি পরিভাষায় রূপক অর্থানুসারে– 'প্রকৃত গাউসুল আ'যম নন, বরং গাউসুল আ'যমের মতো' বুঝানো হয়। যেমন- ছানী ইউছুপ, ছানী ওয়াইস ক্বরণী ইত্যাদির অনুরূপ অর্থই বুঝানো হয়। অন্যথায় অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের পরবর্তী সময়কালীন হযরত বাবা ভাণ্ডারী (রাদ্বি.) কে প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বলার কোন অবকাশ নেই। এমনকি প্রকৃত অর্থে 'মাইজভাণ্ডার শরীফের দ্বিতীয়' বলে আখ্যা প্রদান করতে গেলেও দু'টি অসঙ্গতি দেখা দেয়! একেত: 'তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার কারণে গাউসুল আ'যম সাব্যস্ত হন'

মর্মের সাথে সমন্বয় হয়না; দ্বিতীয়তঃ বাগদাদের অধিবাসী দুইজনকে গাউসুল আ'যম লিখার ক্ষেত্রে তিনি তদীয় মুরশিদ ক্বিবলাকে দ্বিতীয় গাউসুল আ'যম বলেননি বিধায় এখানেও আবাসস্থল ভিত্তিক প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বলার সূত্র প্রশ্নাতীত নয়!

খ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃক আপন মুরশিদ ক্বিবলাকে গাউসুল আ'যম লিখাটা একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ভুক্ত বিষয়; যা সার্বজনিন বিষয় আদৌ নয়! সার্বজনিন ভাবে বললে তো সর্বস্তরের সুন্নী জনতার মুখে মুখেও তা ধ্বনিত হওয়া পরিলক্ষিত হতো! অথচ তাঁর মুরশিদ ক্বিবলাকে অদ্যাবধি তিনি ব্যতীত তেমন কাউকে গাউসুল আ'যম বলতে দেখা যায় না! এহেন ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে অন্ততঃ তাসাওউফ-ত্বরীক্বত চর্চকারীগণ সম্যক অবগত আছেন যে, আপন আপন মুর্শিদের রূপের আয়নায় খোদা-রাসূলের গুপ্তরূপও দর্শন মিলে! এমর্মে আল্লামা আরেফ রূমী (রহ.) বলেন– "তুমি যখন পীরের সত্তাকে গ্রহণ করলে, খোদার আগমনও সে সত্তায় নিহিত, রাসূলেও।" অতএব আপন মুর্শিদের রূপদর্পনে গাউসুল আ'যম দর্শন হেন ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় আদৌ সার্বজনিকও নয় এবং সার্বজনিক বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণও নয়।

উল্লেখ যে, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) এর প্রধান খলীফা হযরত শাহসূফী মাওলানা আব্দুল মা'বুদ আল্ ক্বাদেরী (রহ.) কর্তৃক হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কে যুগের গাউসুল আ'যম লিখা প্রভৃতিও উক্ত একইরূপ ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। এসব ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় সার্বজনিকের সাথে তখনই বিরোধপূর্ণ হয়, যখন অপর কাউকেও তা মানতে বাধ্য করার মতো বক্তব্য কিংবা আচার-আচরণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। আর এ সব ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়নি বিধায় সার্বজনিক বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণ বলারও কোন অবকাশ নেই।

গ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র ভাষ্য মোতাবেক– "পরীস্তান রাজ্যের রুক্বাম শহরের বাসিন্দা (স্বজাতীয়) শাহানশাহ বক্তানূস জিনদের মধ্যে গাউসুল আ'যম।" এক্ষেত্রে বলা যায়– এটি মানবজাতির সাধারণ বোধবুদ্ধির আয়ত্বের বাইরে, মানবজাতি থেকে ভিন্ন একটি জাতিরই বিষয়। অতএব তা' মানবজাতির বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বিধায় বিরোধপূর্ণ হওয়ার বিষয়ও নয়।

(৩) কেউ যদি পদ-পদবী আর ক্ষমতা ও মর্যাদগত খেতাব-অভিধা-উপাধির তারতম্য বুঝতে ব্যর্থ হয়ে গাউসুল আ'যমিয়তকে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদ কল্পনা করত: অভিষেক ধারণায় গাউসুল আ'যমের সংখ্যা দু'য়ের বেশী বলে জ্ঞান করে থাকে, তজ্জন্য এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে। আর তা'হল– গাউসুল আ'যমিয়তের তাজ-শিরোপা, যা (বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদত্ত হওয়ার প্রতীক স্বরূপ) গাউসুল আ'যমের শির মুবারকে স্থাপিত ও সংরক্ষিত; তা'কি বেলায়তের কোন পদ বা মসনদ বলে বিবেকসম্পন্ন কেউ ভাবতেও পারে! কোথায় শির মুবারকে স্থাপিত গাউসুল আ'যমিয়তের প্রতীক তাজ-শিরোপার সুমহান মর্যাদা; আর কোথায় অধিষ্ঠান-আরোহণ-উপবেশনের মসনদের অবস্থান!! হায়রে বিবেকের বিপর্যয়!

হে বিবেক! গাউসুল আ'যমের শির মুবারকে স্থাপিত ও সংরক্ষিত তাজ-শিরোপাই হচ্ছে-গাউসুল আ'যমিয়তের প্রতীক; যা ইহ জগত থেকে পর্দা করা অবস্থায়ও তাঁর শির মুবারকে সংরক্ষিত থাকে। আর গাউসুল আ'যম যে মুবারক মসনদে ইতপূর্বে সমাসীন ছিলেন, সে মুবারক মসনদ বা পদের নাম হচ্ছে– গাউসিয়ত বা কুত্ববিয়ত; সেখাইে মাত্র অপরজনের অভিষেক ঘটানো হয়। **(চলমান)**

সূফি উদ্ধৃতি

■ কুস্বভাবাপন্ন আলেম অপেক্ষা সুস্বভাবাপন্ন ফাসেকের সাহচর্য উত্তম।

■ আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা।

■ স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার নাম রোজা।

■ তাওবার অবস্থা তিনটি। যথাঃ (১) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা, আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে নিজেকে পাক রাখা।

■ সত্যবাদীর নাম হল সততা। যে ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়, সে-ই সিদ্দীক।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ)

আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'

মূলঃ

যুগের মনসুর, প্রেমাস্পদের নূরী আননের প্রেমবিভোর, শরীয়তের মহাজ্ঞানী, মারফতের বিজ্ঞানী, ত্বরিকত বিদ্যার পরিবেষ্টনকারী, হাকিকত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সর্বসম্মানিত বাহরুল উলূম জনাব মাওলানা আবুল বরাকাত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গণি আচ্ছাফী আল্ মকবুল কাঞ্চনপুরী কদ্দাসাল্লাহু সিররাহুন্নূরী

ভাষান্তরঃ

• বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর •

আরবী ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে এক অনন্য গ্রন্থ 'আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' ইসলাম ধর্মদর্শনের নিখাদ দর্শন কলমের আঁচড়ে যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ় বাধনে দীপ্তি ছড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্তে চমকের দোলায় চমকে উঠে পাঠক। উন্মোচিত হয় বিবেকের রুদ্ধদ্বার, উদ্বেলিত হয় অনন্ত প্রেমাবেগ। অপসারিত হয় দ্বিত্বের পর্দা। গ্রন্থটি প্রত্যেক খোদা অন্বেষীর জন্য অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার যোগ্য গাইড লাইন। মুরিদ বা উদ্দেশীর জন্য মুরাদ বা উদ্দেশিত। রুগ্নান্তরের চিকিৎসায় একই সাথে ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

সূফি দর্শন আজ কিছু সংখ্যক মতলববাজের খপ্পরে পড়ে নিজস্ব রূপ-যৌবন তথা স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। সূফি বেশধারী ব্যবসায়ীদের প্রতারণায় ফেঁসে দ্বীন-দুনিয়া উভয় কূলহারা মানুষ এ পবিত্র দর্শনকে ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে গাদায় গাদায়। বিশেষতঃ নিরেট সূফি দর্শনের যুগোপযোগী সংস্করণ মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতে মন্দ বলছে মাইজভাণ্ডারীদেরকে। এহেন পরিস্থিতিতে সূফি দর্শন ও মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার নির্ভেজাল দর্শন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমীপে তুলে ধরার নিমিত্তে উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইলহামী জ্ঞানের সফল ভাষ্যকার বাহরুল উলূম আল্লামা মকবুল রচিত আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' গ্রন্থটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতল সমুদ্র। সিন্ধু তলের মুক্তা আহরণ ডুবুরীর পক্ষেই সম্ভব। কৃতি লেখক ও অনুবাদক জনাব বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর অতি সাহসিকতার সাথে উক্ত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আলোকধারার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

পূর্বপ্রকাশিতের পর:

পঞ্চম পরতও বা রশ্মি: কারামত নিদর্শন হযরত (রা.)'র হুলিয়া শরীফ বা পবিত্র আকৃতি ও কতিপয় প্রকৃতির বর্ণনা: ওই জগতসম্রাটের ভক্ত-অনুরক্তদের নিকট প্রকাশ থাকে যে, মহাত্মন হযরত মঙ্গল-প্রাচুর্যের আকর (রা.) না কৃশ, না স্থূল, বরং মধ্যম আকৃতি, গোধূম রং বিজড়িত, ভ্রূ দীর্ঘ, শুভ্র সুন্দর শ্মশ্রু মণ্ডিত ছিলেন। শির মোবারকের পবিত্র সফেদ চুল কান মোবারকের লতি ছোঁয়া ছিল। চেহারা মোবারক উজ্জ্বল ঈষৎ লম্বাটে গোলাকৃতির চতুর্দশীর পূর্ণশশীর ঈর্ষা ছিল। পবিত্র বক্ষ প্রশস্ত কিঞ্চিত স্ফীত হালকা কেশর আচ্ছাদিত ছিল। পবিত্র জঠর পুষ্পিনাসনের ন্যায় মসৃণ, হস্ত মোবারক বিস্তৃত, আঙুল সমূহ সরু মসৃণ, নখ দাবানো ছোট-খাট, পা মোবারকের বুড়ো আঙুল দ্বয়ের রৌপ্যবৎ হালকা সাদাটে দেখাত।

غزل

معنی کل من علیها ہوے روشن ÷ حسن پیاریکا جوا کرتر کہوں گا

ینفخ فی الصور کا ہوراز ہویدا ÷ تیرے جلالت کی نشانی جود کہونگا

معنی یحیی العظام کا ہولائح ÷ قندلیا تیرے خطاس جو سنونگا

سرّ ویاتین من کل فجاج ÷ ہوویگا روشن جو ہیں دربار دکہونگا

سر طواف حرم محترم اللہ ÷ کشف ہو جو تیرے گلیوں میں پہرونگا

معنی والشمس وضحها کا ہوروشن ÷ مصحف رخسار کو تیرے جو پڑہونگا

سورہ واللیل کا ہوراز ہویدا ÷ کاکل مشکیں جو میں سنگار کرونگا

سر رحیق مختوم کا ہوواضح ÷ پیارے ترے لکی صفت جو میں کہونگا

لولومرجانکی حقیقت ہو مجھے کشف ÷ پیارے تجن ترے جو دندانکو دکہونگا

راز ید اللہ کی ہوجائیگا مکشوف ÷ دست ختائی کو تیرے جبکہ دکہونگا

کلم موسیٰ کی حقیقت کہلے مجہپر ÷ شیرین لبا تجھ سے جبھی بات کرونگا

جان جہاں نجم نین تجھکو کرونگا ÷ جی بھر کے ترے حسن کا تب جلوہ دکہونگا

ما رمیت اذ رمیت کی ہو روشن سر ÷ تیرے تصرف کو جو میں غور کرونگا
معنی فاصطادوا کا واضح ہو بخوبی ÷ ابرو دو مژگا کو تیرے جبکہ دیکھونگا
سر یکاد البرق ہو دیگا پیدا ÷ تیرے تبسم کو جو میں پیارے دیکھوں گا
غوث اعظم سر لقا پائے گا مقبول ÷ نقش پا ہو تجھ میں جو میں پیارے مٹوں گا

গযল

জগৎপ্রাণ নয়ন তারা তোমায় করিব।
মন ভরিয়ে তব রূপের চমক দেখিব।
'জগত পরের সব বিলীন'(১) বাণীর মর্ম প্রকাশিবে
প্রিয়ার রূপের কিরণ যবে নয়নে হেরিব।
'সিঙ্গায় ফুঁক দিবে'(২) বচনরহস্য হবে উদ্ভাসিত
তব মাহাত্ম্যের নিশান যবে চোখে দেখিব।
'হাঁড় ঝিন্দা করবে'(৩) বাণীমর্ম হবে উদ্ভাসিত
তব মুখের মিষ্ট বচন যখন কানে শুনিব।
'আসবে সকল দূরপথ থেকে'র(৪) রহস্য হবে উজ্জ্বল
দরবারে সমাবেশিত লোকের ভিড় যবে দেখিব।
আল্লাহর পবিত্র হরমের তাওয়াফ রহস্য খুলবে
তব গলিতে এদিক ওই দিক যবে ফিরি।
'শপথ সূর্য ও তার রশ্মির'(৫) মর্ম হবে দীপ্ত
তব আনন কিতাব যবে আমি পাঠ করিব।
'রাত্রির শপথ'(৬) সূরার রহস্য হবে উন্মোচিত
সুগন্ধ কেশর গুচ্ছ যখন আমি সাজিয়ে দিব।
'মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়'(৭) এর রহস্য হবে প্রকাশিত
প্রিয় তব ওষ্ঠের বৈশিষ্ট্য যবে বর্ণনা করিব।
লুলু ও মরজানের হাকীকত পাবে প্রকাশ মোর পরে
প্রাণ প্রিয়তম উজ্জ্বল দন্ত তব যখন দেখিব।
'আল্লাহর হাত'র(৮) রহস্য হবে সদা উন্মোচিত
রাঙাহাত তোমার যখন আমি চোখে দেখিব।
'মূসা সনে কহিছেন কথা'র(৯) মর্ম হবে উদ্ভাসিত
খোশ কথক তব সনে যবে আমি কথা কহিব।
'নিক্ষেপ করোনি যবে নিক্ষেপিলে'র(১০) রহস্য হবে স্পষ্ট
তব ক্ষমতার দাপট যবে আমি ধ্যান করিব।
'তবে শিকার করতে পার'র(১১) মর্ম হবে উদ্ভাসিত
ভ্রূ ও পলকঠার প্রিয়া তব যখন আমি দেখিব।
'বিদ্যুৎ চমক কেড়ে নেবে'র(১২) মর্ম হবে প্রকাশিত
প্রিয়া তোমার মধুর হাসি যবে আমি দেখিব।
গাউসুল আ'যম মিলন মধু পাবে যে মকবুল
তব কদম চিহ্ন পরে যখন আমি মিশে রহিব।

টীকা: উক্ত গযলে উদ্ধৃত আয়াত সমূহের তথ্যসূত্র: (১) সূরা আর্‌রহমান ২৬নং আয়াত (২) সূরা নাবা ১৮নং আয়াত (৩) সূরা ইয়াসীন ১০৪নং আয়াত (৪) সূরা হাজ্ব ২৭নং আয়াত (৫) সূরা শাম্‌স ১নংআয়াত (৬) সূরা লায়ল ১নং আয়াত (৭) সূরা মুতাফফিফীন ২৫নং আয়াত (৮) সূরা ফাত্‌হ ১০নং আয়াত (৯) সূরা নিসা ১৬৪নং আয়াত (১০) সূরা আনফাল ১৭নং আয়াত (১১) সূরা মা-ইদাহ ২নং আয়াত (১২) সূরা বাক্বারা ২০নং আয়াত।

মহান হযরত (রা.) অধিকাংশ সময় শুভ্র মনোরম পোষাক পরিধান করতেন। উত্তম চাল-চলন ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। প্রায়শ অনাবৃত মস্তক থাকতেন। পবিত্র পাদুকাদ্বয় কর্তিত ফিতা বিশিষ্ট পরতেন। এত্তো উচু মান-মর্যাদা ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পলকের জন্যও সাধনা থেকে বিরত অন্তর হতেন না; বরং সর্বদা মর্যাদা ও স্তরে উচ্চতার সন্ধানে থাকতেন এবং শ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রচেষ্টার কদম উচ্চ স্তর-মর্যাদা ও মকামে উন্নতির জন্য সম্মুখে বাড়াতেন। সর্বক্ষণ বুলবুলের ন্যায় رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'প্রভু হে আমাকে বাড়িয়ে দাও জ্ঞান' (ক) রবে عند مليک مقتدر 'সম্মানিত রাজাধিরাজের সান্নিধ্যে' (খ) নৈকট্যের গীত গাইতে থাকতেন। তিনি কখনো খাট-পালঙ্কে শুইতেন না এবং মশারির মধ্যে আরাম করতেন না। কখনো কখনো কনকনে শীত মৌসুমেও কম্বল লেপ গায়ে জড়াতেন না। পানাহারে যখন যা থাকত তাতে তুষ্ট থাকতেন এবং শাক-সবজি যা-ই সম্মুখে পেশ হত খেয়ে নিতেন। বরং অন্যান্য কিছুর চেয়ে সবজি জাতীয় তরকারি অধিক পছন্দ করতেন। হাদিয়া তোহফা প্রচুর আসত, অধিকাংশ সময় তা থেকে প্রথমে আনয়নকারীকে দিতেন এবং নিজেও কবুল করতেন। কখনো খিদমতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে নিজ হাতে নামে নামে বন্টন করতেন। কখনো আন্দর মহলে নিয়ে যেতে বলতেন। কখনো প্রতিবেশীদের বিলিয়ে দিতেন। ধৈর্যশক্তি এতই প্রবল ছিল যে, অধিকাংশ সময় আহলে হাজাত মজলিসে শোরগোল করত; তবুও কোনরূপ কটুবাক্য পবিত্র মুখে উচ্চারিত হতনা, বরং অতি মিষ্টবচনে সকলের সমস্যা জেনে নিয়ে সমাধান করতেন। মহল্লাবাসীরা প্রায়শ হাদিয়া-তোহফা বন্টনের সময় দরজায় ভিড় করত অথচ তাতেও ধৈর্য-সহ্য বিচ্যুত হতেন না। অধিকন্তু জালালী অবস্থায় নিকটে যাওয়ার সাহস কারো ছিলনা। প্রাথমিক অবস্থায় মহান স্বভাবে অধিকাংশ সময় জালালের প্রাবল্য থাকত, শেষ বয়সে জালাল থেকে জমাল বেড়ে যায়। এত্তো উচ্চ মর্যাদা-মরতবা সত্ত্বেও দয়ার দৃষ্টিতে ছোট-বড়, আবাল-বৃদ্ধ সকলের খবরাখবর নিতেন। যদি কেউ তাঁর সামনে তাঁর

কোন সমবয়সী, সঙ্গি, সাথী, সহপাঠি, বন্ধু-বান্ধব কিংবা চেনা-জানা কারো নাম নিত, তবে নামোচ্চারিত ব্যক্তি জীবদ্দশায় থাকলে তার জন্য তাবারুক ও আনীত তোহফা প্রেরণ করতেন এবং তার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। নামোচ্চারিত ব্যক্তি যদি পরলোকগত হন তবে তার পরিবার-পরিজনের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করতেন। যে ব্যক্তি জীবনে একবার তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছে, সে আমৃত্যু তাঁর দয়ানুগ্রহের কথা কখনো ভুলতনা। খাদেমদের প্রত্যেকের দৃঢ় বিশ্বাস ও স্থির ধারণা এমন ছিল যে, তাঁর দয়ার দৃষ্টিতে আমার থেকে প্রিয় ও আদুরে দুনিয়ার বুকে আর কেউ নেই। খাদেমদের কাউকে দু'য়েক ঘন্টা না দেখলে তার খবর নিতেন। পানাহারের সময় খাদেমদের না দেওয়া পর্যন্ত নিজে কখনো খেতেন না। ধনী-দরিদ্র সকলকে সমান স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখতেন; বরং আমীর-ওমরার তুলনায় নিঃস্বদের অধিক সঙ্গ দিতেন। তাঁর প্রাচুর্য-স্মারক দ্বারে যে দয়াপ্রার্থী ভিক্ষার হাত প্রসারিত করেছে, সে কখনো বিফল ফিরেনি, বরং প্রার্থনার আঁচল তিনি আশা-আকাঙ্ক্ষার পুষ্পরাজিতে ভরে দিয়েছেন।

পংক্তি

کی رود محروم اے دل از مراد خویشتن ÷ ہر کسیکو دامن آں شاہ شاہاں در گرفت

تاج عزت بر سر و ہم ناز بر گردوں کنم ÷ در غلامی تا کہ آں سلطان خوبان دو گرفت

হে অন্তর! অভীষ্ট অর্জনে সে কি কভু বঞ্চিত রবে?
যে ধরেছে আঁকড়ে ওই রাজাধিরাজের পবিত্র দামান।
সম্মানের মুকুট শিরে এবং গর্ব করি হিম্মত পরে
গোলামীতে যে ওই রূপের রাজা করিলেন বরণ।

গযল

معدن نور خدا بحر ولایت آپ ہیں ÷ چرخ رحمت پر سدا ابر عنایت آپ ہیں

آفتاب عرش عشق و ماہتاب دلبری ÷ قلزم بے حد عشق و محبت آپ ہیں

حسن عالمگیر سے اپنے کیا تسخیر کل ÷ بادشاہ و سرور ملک رشاقت آپ ہیں

نازنین تخت ناز و مائیہ حسن و جمال ÷ رونق افزائے رخ اورنگ الفت آپ ہیں

آسماں پر عرش پر تختی ہے ڈنکا آپ کا ÷ آفتاب عرش قدر و عزت و عظمت آپ ہیں

در مقام قربت عند ملیک مقتدر ÷ بالیقیں سلطان دار الملک قربت آپ ہیں

آپ ہیں مرد خدا مردی سزاوار آپ کو ÷ پلہ تاز عرصہ تلخ ریاضت آپ ہیں

آپ کے نظروں سے سبکا سبز ہے گل مراد ÷ معدن جود و کرم بحر سخاوت آپ ہیں

اہل حاجت روز و شب تھے آپکے دربار پر ÷ صاحب لطف و عطا عظم و مروت آپ ہیں

آپ کے فیض نظر نے کس کو چھوڑی بے مراد ÷ ہر دو عالم میں خداوند فتوت آپ ہیں

آپ کے دربار سے کیونکر کوئی مایوس ہو ÷ والا قدرت آپ ہیں اور بحر رحمت آپ ہیں

دو جہاں میں وقت مشکل کیا مجھے مقبول زار ÷ میرے آقا غوث الاعظم ذی حمایت آپ ہیں

খোদার নূরের খনি বেলায়ত-সাগর হন আপনি
দয়ার আকাশ পরে সদা দানের মেঘমালা যে আপনি।
প্রেমার্শের দিনমণি ও প্রেমাস্পদত্বের পূর্ণশশী
ইশ্‌ক আর মুহব্বতের অনন্ত দরিয়া হন যে আপনি।
জগন্মোহন রূপে বিমোহিত করলে সৃষ্টিকুলে
কমনীয়তার রাজ্য মাঝে রাজাধিরাজ হন যে আপনি।
মনোমুগ্ধতার আসনে মনমোহিনী রূপ গুণের খনি
ভালবাসার সিংহাসনে আলোকিতকারী আনন আপনি।
আকাশে আর্শে বাজে সদা তোমার বিজয় ডঙ্কা
সম্মান-মহাত্ম্য-মর্যাদার আর্শে মধ্যাহ্ন রবি আপনি।
'মহাপ্রতাপশালীর সন্নিধান' নৈকট্যের উচ্চাসনে
নিশ্চয় নৈকট্যরাজ্যে সুমহান সুলতান হন যে আপনি।
আপনি মর্দে খোদা পৌরুষ শোভা পায় আপনাকে
সাধনার দুর্গম প্রান্তরে রাজবাহাদুর হন যে আপনি।
আপনার কৃপাদৃষ্টিতে সকলের আশার বাগ সজীব
উদারতা-মহানুভবতার খনি দানশীলতার সাগর আপনি।
আহলে হাজত দিবারাত্র ভিড় করিত তব দুয়ারে
দয়া-কোমলতা-সহনশীলতা ও মানবতার অধিপতি আপনি।
আপনার কৃপাদৃষ্টি বঞ্চিত ছাড়েনি কাউকে
উভয় জগতে প্রভু-গুণজ্ঞ উদারদাতা যে আপনি।
আপনার দরবার থেকে কি করে কেউ আশাহত হবে
অতি শক্তিধর আর দয়ার দরিয়া হন যে আপনি।
দু'জগতে সঙ্কটকালে মকবুল আমার কিসের ভর
আমার আকা গাউসে আ'যম রক্ষাকর্তা হন যে আপনি।

মহান হযরত (র.)'র নসিহত বাণী সরাসরি আল্লাহর রহস্য ছিল। তাঁর সূক্ষ্ম বচন আপাদমস্তক আল্লাহর কোমলতার মহিমার ব্যঞ্জনা। তাঁর গালিতে এ রূপ মজা ও মিষ্টতা ছিল যে, মূলতঃ তা দুঃখ কষ্ট আর যাতনার উদ্যানে ব্যথিতজনদের সুস্থতার মহৌষধ। তাঁর মিষ্টবচনে জগত হতবাক এবং তাঁর গালি দুঃখ-দুর্দশা নিবারক। তাঁর প্রতি শব্দ অফুরন্ত হিকমত রহস্যে পরিপূর্ণ। তাঁর মধুর হাসি আল্লাহর তজল্লীর দ্যুতি। সুবহানাল্লাহ! কেমন সুমিষ্ট বাচক যে, তাঁর প্রতিটি শব্দ রহস্যাবলীর মধুর রসে ভরা।

গযল

اے نازنین نازک بدن تجھ سا نہیں شیریں دہن ÷ ہر حرف ہے شکر شکن ہر لفظ سرو دلکش سخن

ہے سچ سچ ہے بالیقیں جو ہو خدا کا نازنین ÷ گالی ہے اسکی شکر یں ہے دافع رنج و محن

اک بار شکر آپ کا دشنام کا جس نے چکا ÷ قند و نبات دہر کا بھولے وہی نام و سخن

ہر لفظ ہی حکمت سے پر ہر حرف ہی راز و کلی در ÷ ہے نازاس کو خوشتر جو تجھ سا ہو شکر دہن

کیونکر زبان کلک کا ہووے نہ خوشبو سے بھرا ÷ ہر لفظ ہے مشک خطا ہر حرف ہے مشک ختن

کیونکر نہووے عذب البیاں میرے قلم کی دو زبان ÷ کیونکر نہووے ہر زماں ہر لفظ میرا شعلہ زن

شیریں زبان شکر دہن نازک ادائے گلبدن ÷ ہے کی نازش کا سخن زیب زبان کلک من
صدمرحبا صل علی مقبول تجھکو ہے بجا ÷ بولوں اگر شیریں ادا چوں بلبل خوش لحن

হে মনমোহিনী কোমল বাচক তবরূপ মিষ্টি কথক কেউ নন
প্রতি কর্ণ যে, মধুমাখা প্রতি শব্দ দয়াময়ের রহস্য অফুরান।
সতত সত্য যে নিশ্চয় হবেন যিনি আল্লাহর প্রিয়জন
গালি যে তাঁর মিঠাই হেন দুঃখ-দুর্দশা করে নিবারণ।
একবার করেছে যে আপনার গালির সুরস পান
ভুলিছে সে প্রকৃতির সকল মিষ্টি মধুর নামোচ্চারণ।
প্রতি শব্দই প্রজ্ঞায় ভরা প্রতি বর্ণই রহস্যের মুক্তাছড়া
গর্বতো তারেই শোভে তবরূপ যে মধু কথক হন।
কলমের মুখ হবেনা কেন খুশবোতে পূর্ণ গুলাব হেন
প্রতি বাক্যে কস্তুরি ঘ্রাণ প্রতি বর্ণে হয় মেশক উৎপাদন।
হবেনা কেন মধুবর্ষী আমার কলমের দুই যবান
না হবে কেন যুগ-যুগান্তে আমার সূক্ষ্মতায় মন হরণ।
প্রিয় অধর মিষ্ট বচন কোমল অঙ্গ পুষ্পবদন
তাঁর কোমলতার কথন আমার মসি-মুখের শোভন।
ছন্দ মারহাবা ছন্দে আলা মকবুল তোমায় সাজে
বল যদি মধুর আচরণ বুলবুল যেন মধুর গায়েন।

তাঁর সুন্দর চলনে এমন ছন্দময় হেলন দোলন ছিল যে, যেন খঞ্জন ও চকোরের নাচন। নয় নয় বরং তিনি হুর-পরীর মূল ও উৎস ছিলেন। প্রতি কদমে প্রেমাস্পদত্বের নমক-ঠমক দেখাতেন। যখনই তিনি আশিকদের আর্শতুল্য অন্তরের প্রেমাসনে কদম রাখতেন, তখনই প্রেম-খঞ্জরে বধিত সহস্র শহীদের মস্তক পবিত্র পায়ের চিহ্ন হয়ে যেত।

غزل

برحسن وادائے تو حور و پری فدائے تو ÷ شمس و قمر گدائے تو در دم جلوہ ہائے تو
سرو و غزال زقد تو غیرت در و خد تو ÷ کیست کہ یافت خد تو در حسن و ادائے تو
نازی زپائے تا بسر تا کہ شوی تو جلوہ گر ÷ خلق جہاں را سر بسر در جبین سجدہ ہائے تو
آدم و شیث و نوح را عرش و کرسی لوح را ÷ جملہ جسم و روح را سر بہ نیاز پائے تو
گرد جہاں چار سو رہ سپریم کو بکو ÷ در دو جہاں کیست او نیست بدل ولائے تو
عشق تو زاول زماں روح صفت نہاں بجاں ÷ میشود ایں زماں عیاں دل طلبد از برائے تو
گر تو ہزار غم دہی یا بتر ے بسر نہی ÷ کی کنیم از تو دل تہی مغز وفا جفائے تو
ناز کشیم اچنیں زانکہ تو شاہ نازنین ÷ باد ہزار جان و دین صد قد ناز ہائے تو
ہاں دمی جلوہ یکس از رہ لطف یکسخن ÷ صد قد تست جان و تن در سر یک ادائے تو
غوث اعظم بپائے تو مقبول تو گدائے تو ÷ جملہ ماسوائے تو صد قد یک لقائے تو

তব রূপ আর ঠমক পরে হুর পরী প্রেমিক তোমার
চাঁদ সুরজ তোমারই দাস জলওয়ার চমকে তোমার।
সাইপ্রাস বৃক্ষ লজ্জিত তব গঠনে ঈর্ষা করে তব আননে
পাবে কে নাগাল সীমা তব রূপ সৌন্দর্যে তোমার।
আপাদ মস্তক লাস্যময় হবে বলে আগমন তোমার
সৃষ্টি জগত আদি অন্ত আনত ললাট সাজদায় তোমার।
আদম, শীস ও নূহ আর্শ, কুরছি ও লওহ
সকল তন আর রূহ উন্মুখ পদার্পণে তোমার।
ঘুরেছি জগতে চার পাশে ভ্রমেছি পর্বত শিখর
দু'জগতে নেই কেউ হতে পারে উপমা তোমার।
তব প্রেম প্রথম যুগে আত্মাবৎ প্রাণে গুপ্ত ছিল
এ যুগে ব্যক্ত হল দিল অস্থির জন্য তোমার।
দাওগো যদি হাজার দঃখ তুমি বিনে কাটেনা কাল
করি কেমনে তোমা থেকে হৃদয় ছিন্ন বন্ধুত্বসার শত্রুতা তোমার।
গর্ব করিব এমনই যেহেতু তুমি প্রেমাস্পদ রাজ
সহস্র দ্বীন-প্রাণ কুরবান ঠমক পরে যে তোমার।
টুকু দেখা দাও কৃপাগুণে একটু কথা কহ
তোমাতে উৎসর্গিত মনোতন টুকু ভঙ্গিমায় তোমার।
গাউসুল আ'যম তব কদমে তব মকবুল দাস তোমার
তুমি ভিন্ন সকলি দেব টুকু মিলন পরে তোমার।

মহান হযরত (রা.)'র দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনাসক্তি এমন পর্যায়ের ছিল যে, হাত মোবারক দ্বারা কখনো টাকা-পয়সা স্পর্শ করতেন না। অধিকন্তু দৈবাৎ কখনো হিকমতের দৃষ্টিতে হাতে নিতেন। বরং কোন ব্যক্তি তাঁর প্রাচুর্যমন্ডিত খিদমতে দু'চার দিন থাকত, তার অন্তরও দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য্য হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হয়ে যেত।

পংক্তি

محراب ابرو تو ہر دیدہ کہ دیدہ ÷ از کعبہ و مساجد یکسر دلش رمیدہ
ہر کو چو گرد پایت پاکش بہ تو پیوست ÷ از تیغ یک نگاہت گشت از جہاں بریدہ

ভুরু চত্বর তোমার যার আঁখি হেরেছে
কা'বা ও মসজিদ থেকে দিল তার পালিয়েছে।
যেবা তব পদধূলিবৎ পদচিহ্নে মিশেছে
তব এক চাহনির তরবারীতে জগৎ-সংসার ছেড়েছে।

তিনি পুরো ইহলৌকিক জীবনে কখনো কোন দুনিয়াদার কিংবা আমীর-ওমরা ও ধনীদের সম্মানে দাঁড়াননি, বরং সকল আমীর-ওমারা ও ধনাঢ্য মনোপ্রাণে তাঁর পবিত্র চরণযুগলে উৎসর্গিত ছিল।

পঙ্ক্তি

مقبول بر در پاک غوث تجھ نہ داری ÷ ہر کس سر نہادہ او مرد سر فرازست

মকবুল! গাউসে মাইজভাণ্ডারীর পাক দুয়ারে
যেবা রেখেছে মস্তক সে হয়েছে শিরোন্নত। (চলবে)

হযরত ফাতিমাতুজ জাহ্‌রা (রাদ্বি.) ও আজকের নারী সমাজ

• অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান •

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্মানিত নারী এসেছেন, যাঁরা সমাজকে বিভিন্ন আঙ্গিকে কিছু কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীজির কন্যা হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) ছিলেন একজন আদর্শ কন্যা, একজন আদর্শ স্ত্রী এবং একজন আদর্শ মাতা ও একজন আদর্শ নারী। তাঁর এক নাম ছিল 'বতুল'। তিনি খুবই কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন বলে তাঁর এ নাম দেয়া হয়েছিল। তাঁর অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে তাঁকে আজ্ জাহ্‌রা নামেও ডাকা হতো।

বর্ণগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল যুগের নারীদের সার্বিক মূল্যায়ন করা হলে দেখা যাবে মহীয়সী ফাতিমার জীবন চরিতই নারী জাতির জন্যে আদর্শ মডেল। নবুয়্যতের নিভৃতগৃহে খোদায়ী আশীর্বাদ হিসাবে হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রা (রাদ্বি.) এর পবিত্র গর্ভে ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ফাতেমা জাহ্‌রা (রাদ্বি.) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকেই মহানবীর সাহচর্যে বড় হয়েছেন ফাতিমা। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট নবীজি ভোগ করেছেন তাঁর সাথী ছিলেন ফাতেমা (রাদ্বি.)। তিনি যখন একেবারে ছোট তখনই বনি হাশেমকে 'শিয়াবে আবু তালেব' বা আবু তালেব উপত্যকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছিলেন। মাতা-পিতার সাথে স্নেহময়ী মা ফাতেমাও এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন।

হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) খুব ছোটবেলা থেকেই পিতা মহানবী (দ.) এর সাথে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রিয় পিতার সেবা শুশ্রূষা করে মায়ের মত তিনি মহানবীকে আগলে রাখতেন। তাঁর এই সেবাপরায়ণতার জন্যে তাঁকে ডাকা হতো "উম্মে আবিহা" অর্থাৎ তাঁর পিতার মা। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (দ.) বলতেন, "ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা তাকে যে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়।" তিনি অত্যন্ত সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। তাঁর সম্মানে কুরআনের অনেক আয়াতও নাযিল হয়েছিল।

হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) অত্যন্ত জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। জ্ঞান আলোচনায় তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। তিনি জ্ঞান সাধনার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। আজকে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে বাঁচতে হলে এই আদর্শ নারী হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) কে অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামে নারীর অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়। যখন নারীদেরকে হীন মনে করা হতো, তারা পুরুষের সাথে কোন সামাজিক কাজ কর্মে অংশ নিতে পারত না, তাদেরকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অনুমতি দিত না, ঠিক তখনই ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে নারীদেরকে নিজ সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে। অথচ, উনবিংশ শতক পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী এবং ইটালীর মত ইউরোপীয় দেশগুলোতেও নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামই নারীকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। মহানবী (দ.) তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাদ্বি.)কে যথাযথ সম্মান দিতেন। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ইসলাম মূলতঃ একটি যুক্তি নির্ভর ধর্ম বলেই নারী পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী (দ.) এর যুগসহ ইসলামী ইতিহাসের সকল যুগে নারীরা তাদের উপযুক্ত সব পেশাই গ্রহণ করেছে। সেবিকা ও শিক্ষিকা হিসাবে তাঁরা কাজ করেছেন। প্রয়োজনে যোদ্ধা হিসাবে পুরুষের পাশে থেকে যুদ্ধও করেছেন।

আজকের এই যুগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ কিংবা ইসলামী উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রভাবাধীন মুসলিম জনগণ কিংবা আধুনিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমান কেউই ইসলামের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তারা বুঝতে পারে না কেন আজ বিশ্ব জুড়ে নারীরা বিভিন্ন অপতৎপরতা সত্ত্বেও অধিকহারে ইসলামের ঐশী মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আজ হোক কাল হোক বিশ্ববাসীর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে দুনিয়ার কোন বিধানই ইসলামের চেয়ে অধিক প্রগতিশীল নয়।

মানব ইতিহাস বিভিন্ন যুগে বহু বিস্ময়কর প্রতিভা ও পুণ্যবতী মহীয়সীর আগমন প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু নারী সমাজের জন্যে হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর মত এমন গৌরবময়ী সর্বাত্মক

অনুপম আদর্শের দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই। বহুমুখী গুণের অভূতপূর্ব সমাহার এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি তাঁর মাঝে যেমন ফুটে উঠেছে তার কোন তুলনা নেই। আজকে আমাদের সমাজের নারীরা যখন বিবিধ বঞ্চনা ও জুলুম-নিপীড়নের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন মহীয়সী হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর জীবনের দিক নির্দেশনা আমাদের সংকট উত্তরণে একটি বিরাট মাইল ফলকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

হযরত ফাতিমা জাহ্‌রা (রাঃ) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মহীয়সী নারী মানব ইতিহাসে আর আগমন করেননি। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন মানবজাতির মুক্তিদাতা সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। এটা সত্যি যে মানব ইতিহাসে যুগে যুগে বিভিন্ন পূণ্যবতী ও মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু, তাঁদের প্রতিভা এবং সমাজের প্রতি তাঁদের ভূমিকা কোন বিশেষ বিশেষ দিককে আলোকিত করেছে। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর ভূমিকা গোটা নারী জাতির জন্যে অনুপম আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নবী চরিত্রের বিভিন্ন দিক নির্দেশনায় ফাতিমা জাহ্‌রা (রাঃ) এর অবদান অতুলনীয়। তাঁর মাঝে যে রকম বিভিন্ন গুণের সমাহার ঘটেছে তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নবী দুহিতা ফাতিমা (রাঃ) যেমন ছিলেন আদর্শ কন্যা তেমনি ছিলেন আদর্শ স্ত্রী এবং তিনি একজন আদর্শ মাও ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন নারী অধিকারের প্রবক্তা। নারী অধিকার নিয়ে তাঁর বাস্তবোচিত পদক্ষেপ সর্বকালের নারী সমাজের জন্যে এক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রয়েছে।

খুব ছোটবেলায় মা খাদিজাকে হারিয়ে ফাতিমা (রাঃ) একা হয়ে যান। ইন্তিকালের সময় হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রচুর ধনসম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। সেই সম্পদের কোন প্রভাব বালিকা ফাতিমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। মহীয়সী মায়ের মতই তাঁর সকল ধনসম্পদ ইসলাম প্রচারে সহায়তার জন্যে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার হাতে তুলে দেন। স্নেহময়ী মায়ের তিরোধানের পর থেকে ফাতিমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। নবী পিতার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। মক্কার কাফিররা প্রায়ই মহানবী (দ.)কে উত্যক্ত করত, তাঁর উপর অত্যাচার চালাত সেই সময় স্নেহময়ী মায়ের মত বালিকা ফাতেমা (রাঃ) পিতার পাশে এসে দাঁড়াতেন। পিতার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতেন। পিতাকে কাফিরদের কাছ থেকে আগলে রাখার চেষ্টা করতেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হতেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) মহানবী (দ.)'র কন্যা হয়েও স্নেহময়ী মায়ের মত মহানবী (দ.)কে ভালোবাসতেন বলেই তাঁর উপাধি হয়েছিল উম্মে আবিহা।

ইসলাম প্রচারের কঠিন মিশন নিয়ে মহানবী দেশান্তরী হয়েছিলেন। তিনি নিজ জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সেই সময়েও হযরত ফাতিমা (রাঃ) পিতার পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মদীনায় পৌছে নবীজি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে বিয়ে দেন। হযরত আলী ছিলেন মহানবীর হাতে গড়া জ্ঞানে গরিমায় শ্রেষ্ঠ একজন আদর্শ মুসলমান। হযরত ফাতিমা এবং হযরত আলীর শাদীয়ে মুবারক সম্পন্ন হওয়ার ফলে ইসলামের সৌরভ পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। মদীনাতেই অনাগত ভবিষ্যতের আহলে বাইতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর পবিত্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ), হযরত জয়নাব কুবরা (রাঃ) ও হযরত জয়নাব সুগরা (রাঃ)। এ পবিত্র পরিবারের বদৌলতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর বংশধারা পৃথিবীর বুকে স্থায়িত্ব লাভ করেন। এই আহলে বাইতের সৌরভে ইসলামের বিকাশ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। ইসলামে আহলে বাইতের মর্যাদা অপরিসীম। প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে মহানবী সীমাহীন স্নেহ করতেন, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। পিতা হয়ে মেয়েকে শ্রদ্ধা করা মানব ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর অসাধারণ গুণাবলী এবং মর্যাদার কারণে মহানবী (দ.) তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মানদানে কুণ্ঠিত হতেন না। নবী (দ.) যখনই ফাতিমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতেন তখনই তাঁকে সালাম জানাতেন, তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন।

হযরত ফাতিমার সম্মানে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে অন্যতম হল 'আয়াতে তাতহির'। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। অন্য আর একটি আয়াতের নাম হলো 'আয়াতে মোবাহিলা'। এই আয়াতের মাধ্যমে আহলে বাইতের সম্মান ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়। একবার খৃষ্টানদের সাথে মোবাহিলার সময় আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (দ.) হযরত

ফাতিমা (রাদ্বি.), হযরত আলী (রাদ্বি.), হযরত হাসান (রাদ্বি.) এবং হযরত হোসাইন (রাদ্বি.) কে নিয়ে ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের এই ঐতিহাসিক মোকাবেলায় খৃষ্টানরা পরাজয় স্বীকার করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এই মোবাহিলার জন্য আহলে বাইতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অন্য আর এক আয়াতে মহানবী (দ.) এর আহলে বাইতকে ভালবাসা মুসলমানদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। জ্ঞান সাধনায়ও হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) ছিলেন অসাধারণ। তিনি মদীনায় নারী সমাজকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁর গৃহ প্রায়ই বিভিন্ন জ্ঞানপিপাসু নারীদের দ্বারা পূর্ণ থাকতো। হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.)'র গৃহকে মদীনার লোকেরা একধরনের শিক্ষাকেন্দ্র বলেই মনে করতেন। কারণ কোন মহিলার কোন কিছু জানা না থাকলে হযরত ফাতেমা (রাদ্বি.) এর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।

একবার এক মহিলা কিছু প্রশ্ন নিয়ে হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর গৃহে এসে হাজির হলেন। তিনি পর পর দশটি প্রশ্নের উত্তর হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর কাছে জানতে চাইলেন। দশটি প্রশ্ন করার পর মহিলা আর বেশী প্রশ্ন করার সাহস পেলেন না। বললেন: "হে নবী কন্যা! আমি আর বেশী প্রশ্ন করে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না"। মহিলার কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) বললেন: "যত ইচ্ছা প্রশ্ন করুন আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমার আব্বা বলে গেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যারা জ্ঞানী এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে জ্ঞানদানের মাধ্যমে পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে অতীব সম্মান ও মর্যাদার সাথে পুনরুত্থিত করা হবে। কাজেই আপনার প্রশ্নের জবাব দান করা আমার জন্য গৌরবের বিষয়। আপনি যত খুশী প্রশ্ন করতে পারেন।"

মা ফাতিমা (রাদ্বি.) মুসলিম সমাজের নারীদের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি নিজের গৃহস্থালী কাজকর্ম নিজ হাতেই সম্পন্ন করতেন। এমনকি তিনি নিজ হাতে যাঁতা দিয়ে গমও পিষতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে অনেক সময় তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যেতো। তবুও আরাম আয়েশকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। সব সময় শ্রমের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিতেন। হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। কেউ কখনো তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফেরত যায়নি। অনেক সময় নিজেদের শেষ সম্বলটুকু দান করে দিয়েছেন, নিজেরা না খেয়ে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছেন। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি এবং তাঁর পরিবার আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহরই ইবাদত বন্দেগী করে দিন কাটিয়ে দিতেন। শত দুঃখ-কষ্ট এবং সংগ্রামের পর আরবদেশে ইসলাম বিজয় লাভ করে। মদিনায় রাজধানী স্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র। আরবের বুকে ইসলামের মহা বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মহানবী (দ.) আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করেন। যাঁদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই মহা বিজয় সু-সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের কথা তিনি প্রাণ ভরে স্মরণ করলেন। এই ত্যাগ স্বীকারকারীদের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম কন্যা ফাতিমার কথা নবীজি ভুলতে পারলেন না। সারাজীবন তাঁর মেয়েটি শুধু কষ্টই করে গেছেন তাঁর তো কিছু পুরস্কার পাওয়া উচিত। তাই তিনি তাঁর নিজের এক টুকরো জমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারীণী মেয়ে ফাতিমাকে দান করলেন। মদীনার নিকটবর্তী খায়বর এলাকায় এই জমিটার নাম 'ফাদাক'। এই এক টুকরা জমির আয় থেকেই নবী পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো। ফাতিমা (রাদ্বি.) বলতেন, "মহানবী (দ.) প্রজ্ঞাময় এক মহা কিতাব রেখে গেছেন। জ্ঞানী আলোকপ্রাপ্ত মহাদার্শনিকের সাহায্য ছাড়া কী করে তোমরা আল কুরআনের লেখা বুঝতে পারবে। তোমরাতো বিপথগামী হয়ে যাবে"। কিন্তু মা ফাতিমার এ কথা উপেক্ষিত থেকে গেছে। পাশ্চাত্যের তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তার ধার করা বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজে পর্দাভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধকে প্রথা ও শৃংখলা হিসাবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে অর্বাচীনের মত ক্ষেপিয়ে তুলছে নতুন প্রজন্মকে। আজকে পর্দার সীমালংঘন সমাজকে এইড্‌স এর কাছে নেবার পরও তারা শয়তানী চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসতে মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়ে মানবতার ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। নবী দুলালীর অনুশীলিত পথ ছাড়া নর্তন কুর্দন করে প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে রেহাই মিলতে পারে না। ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার দিয়েছে আজ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে এসে সেই মর্যাদা ও অধিকার কেন প্রতিষ্ঠিত হয়নি? তিনটি কারণে আজকে নারীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি হলো খৃষ্টান পন্ডিতদের বিদ্বেষ প্রসূত ইসলামের অপব্যাখ্যা। তারা প্রচার করে বেড়িয়েছে ইসলামে নারীর স্বাধীনতা নেই, নারীর কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না। অথচ ইসলামে নারীদেরকে বেশী সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হলো কর্তৃপক্ষকে

খুশী করার জন্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন এবং তৃতীয় হলো মুসলিম দেশসমূহের বর্তমান অবস্থা। ইসলাম নারীকে প্রকৃতপক্ষে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম নারীদেরকে অলস হয়ে ঘরে বসে থাকার বিধান দেয়নি। ঘরেই যদি মেয়েদের বসে থাকার বিধান হতো তাহলে পর্দার কোন প্রয়োজন ছিল না। মেয়েরাও বাইরে কাজ করতে পারবে, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবে। এই জন্যেই পর্দার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ায় হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর জীবনালোচনা ভিত্তিক আলোচনা সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মেয়ে হিসাবে এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসাবে, একজন নারী সমাজের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজে মহিলারা সত্যের জন্যে কাজ করবে এটাই হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর দিক নির্দেশনা। আল্লাহ তায়ালা কোন কাজের আদেশ করার সময় বা কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার সময় সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, "ইয়া আইয়্যুহান্নাস" অর্থাৎ নারী বা পুরুষকে আলাদাভাবে ডাকেননি। এ থেকে বোঝা যায় নারী পুরুষের মাঝে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। নারীরা সেই মানব জাতিরই অর্ধেক অংশ। আল্লাহ কখনো নারীদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেননি। পুরুষের পাশাপাশি তারাও সমাজের কাজ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর জামানায় আমরা নারীদেরকে দেখেছি সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নিতে, যুদ্ধ করতে। ইসলামে মেয়েদেরকে কখনো অবহেলা করা হয়নি। বরং সবচেয়ে বেশী সুবিধা সবচেয়ে বেশী সম্মান দেয়া হয়েছে মেয়েদেরকে। মেয়েদেরকে কর্মঠ এবং সৃজনশীল কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর জীবন অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি ওহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (দ.) যখন আহত হলেন তখন সেই খবর শুনে তিন/সাড়ে তিন মাইল দূর থেকে মা ফাতিমা ছুটে এসেছিলেন পায়ে হেঁটে। তিনি এসে পিতার ক্ষত স্থানের পরিচর্যা করেন। মা ফাতিমার সেই সেবা ও কর্মতৎপরতা থেকে আমাদের নারীদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। মেয়ে মানুষ বলে পিছপা থাকলে চলবে না, বরং অন্যায়-অবিচার রুখে দাঁড়াবার জন্যে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতির কল্যাণে ও দেশের কল্যাণে একজন নারীর জীবনকে আদর্শবতী রূপে গড়ে তুলতে হলে ফাতিমা (রাদ্বি.) এর অনুসরণ করে নির্ভেজাল সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) মানুষের কল্যাণে নিবেদিতা একজন আদর্শ নারী। তাঁর অনুকরণেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি আসা সম্ভব।

হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) অল্প বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ বিপ্লবী চেতনা তাঁর প্রিয়তম ইমাম আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং কন্যা জয়নাব (রাদ্বি.) এর মাঝে সঞ্চারিত করে যান। হযরত ফাতিমার এই বিপ্লবী চেতনা বংশ পরম্পরায় আহলে বাইতের ইমামদের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা যুগে যুগে মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধনে ইসলামী আদর্শের ধারক হিসাবে অমূল্য অবদান রেখেছেন। মহানবী (দ.) এর আদর্শকে সমুজ্জ্বল করেছেন। নারী স্বাধীনতার নামে পুরুষ বিদ্বেষী নারীদের প্রতি ধিক্কার জানানো উচিত। কিছু মহিলা নারী স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে পুরুষের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে চলেছে। এই ধরণের নারী আমাদের সমাজের জন্য কলংক স্বরূপ। শিশু-কিশোরসহ দেশের নারীকূলের চরিত্র ধ্বংস করার জন্যেই টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে নারীদের অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ জাতীয় চক্রান্ত মেনে নেয়া যায় না। আল্লাহ আমাদেরকে সকল অশ্লীলতা ও অপ-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখুন এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নারীজাতিকে হযরত ফাতিমা (রাদ্বি.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।"

■ খাদ্য ভর্তি উদরে কখনো জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।"

– হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)

মাইজভাণ্ডারী তরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাঁর পি.এইচ.ডি থিসিসে বঙ্গে সুফিবাদের প্রভাব বিষয়ে গবেষণায় বঙ্গে সুফিবাদের 'একমাত্র জাগ্রত' কেন্দ্র হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন মাইজভাণ্ডার শরিফকে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৬) তাঁর প্রবর্তিত তরিকা বিষয়ে কোন লিখিত বক্তব্য বা নির্দেশনা রেখে যাননি। ফলে এই 'জাগ্রত কেন্দ্রের' দর্শন বিষয়ে সাধারণ্যে নানামুখী প্রশ্ন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিও নানাভাবে জেঁকে বসে। এমতাবস্থায় মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে বিভ্রান্তির হাত থেকে উদ্ধারের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এই তরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩-১৯৮২)।

তাঁর প্রসঙ্গে স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ডক্টর আবদুল করিমের মন্তব্য সত্যিই প্রণিধানযোগ্য- আমার বিবেচনায় তাঁর [সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী] রচিত বেলায়তে মোতলাকাসহ ছোটবড় ডজনখানেক গ্রন্থ, অপ্রকাশিত লেখালেখি ও ব্যক্তিগত ডায়েরী মাইজভাণ্ডারী দর্শনের এক মহামূল্যবান সম্পদ। বিভ্রান্তিকর নানা ডামাডোলের মধ্যেও প্রকৃত মাইজভাণ্ডারকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে এগুলো দিগদর্শন ও ধ্রুবতারা স্বরূপ।

বঙ্গে সুফিবাদের একমাত্র জাগ্রত কেন্দ্র বাঙালি সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক গণ চেতনার অবিসংবাদিত প্লাটফরম মাইজভাণ্ডারকে সমকালেও (২০১৪) বিভ্রান্তিমুক্তভাবে উপলব্ধিতে তাঁর লেখনী সমূহ অমোঘ অস্ত্র হিসেবে বিবেচ্য।

পূর্ব প্রকাশিতের পর:

বিশ্ব- মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ:

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে ১৯৭৪ ইং সালে প্রকাশিত ৯ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মূলত বেলায়তে মোতলাকারই অংশবিশেষ -বেলায়ত সংক্রান্ত আলোচনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে যেখানে চুম্বক আকারে বর্ণিত হয়েছে সে তুলনায় এ পুস্তিকার বর্ণনা অনেকাংশে বিস্তারিত এবং তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে কয়েকটি দিক এখানে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তা হল-

১. সূফীদের প্রতি অত্যাচার; ২. গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রা.)-এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট; ৩. সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরীর আবির্ভাব; ৪. গাউসুল আ'যম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.)- এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট বর্ণনা, গাউসিয়তের স্বীকৃতি এবং ইবনে আরবী (রা.)-এর ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন।

১. সূফীবাদের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনায় বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের সাথে সূফীদের দ্বন্দ্ব এবং বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের প্রতিনিধি মুফতীদের ফতোয়ার কারণেই সূফীদের উপর বাদশাহের অত্যাচারের কারণ বলে উল্লেখ করে তিনি লেখেন- "ছুফী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের মর্মবাদী মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে আইন চর্চাকারী মুফতীগণের পরামর্শে বাদশাহী ফরমানে ইহাদের বহু মর্মবাদী চিন্তানায়ক বুজুর্গ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিহত, অত্যাচারিত, জেল ভোগ বা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন"।

২. গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রা.)- এর আবির্ভাব সম্পর্কে লিখেছেন যে, "একদিকে সুফিদের উপর মুফতী ও বাদশাদের সম্মিলিত অত্যাচার জেলজুলুম, অপরদিকে রসূল করিম (দ.) থেকে সময়ের দীর্ঘতায় স্বাভাবিক হাদিস বা নবী বাণীর বিভিন্নরূপ ও দলগত কারণে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এহেন অবস্থায় হিজরী চারি শতাব্দীর পর রাজধানী বাগদাদ নগরী তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাগিদে খোদার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গাউসুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রা.)- এর (৪৭১-৫৬১ হিজরী) আবির্ভাব ঘটে। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, অহি ছাড়াও খোদাতালার সাথে যোগাযোগের অন্য পন্থাও আছে, যার নাম "এলাহাম" এবং "এলকা"। ইহা কশ্‌ফ কলবী বিধায় তকলীদী এবং এসতেতলাদীর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ এবং নিশ্চিত।

৩. এ সময় কুতুবুল আকতাব এরশাদী সুলতানুল হিন্দ গরীব নেওয়াজ হযরত খাজা আজমিরী (রা.) বিল বেরাছত শানে বিরাজ লাভ করেন। তিনি বেলায়ত প্রাধান্য যুগের দ্বিতীয় নজীর।

৪. গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)- এর আবির্ভাবের বর্ণনা: এই গ্রন্থে এটিই মুখ্য আলোচনা। এই বর্ণনাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্যে বিশ্ব সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে সময়ের বিবর্তনে যুগের দাবীতে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী

(রা.)-এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে–

হিজরী ১১৪৩ সালের পর এই দ্বীনে মুহাম্মদীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাগিদে হযরত আবদুল গণি তবলুছি (রহ.) এর পরবর্তী সময়ে পথিকের সামনে একটি রঙিন আয়াশি ছবি ঝলমল করিয়া দেখা দিল। বেশীসংখ্যক লোক বিনা পরিশ্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে ভালবাসিল। খানকার লোকদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার সুবিধায় অনেক লোভী ব্যক্তি সংসার অনাসক্তির পরিবর্তে সংসার আসক্তি; নিজ দৈনন্দিন কর্মজীবনের হিসাব বা তেলাওয়াতে অজুদ দেহতত্ত্বের পরিবর্তে সহজ রুজি রোজগারে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজ অবস্থা গোপন করে চলাই সূফীদের অভ্যাস ছিল, এখন নিজ বুজুর্গীর বাহাদুরি প্রচার করিতে উৎসাহী হইয়া উঠিল। চরিত্র গঠন, সৎ স্বভাব অর্জন সূফীজনের নীতিমালা ছিল। এখন দুর্নীতি ও ধোঁকাকেই অনেকে সম্বল করিয়া নিল। ফলে যাহা স্নেহ-ভালবাসা ছিল তাহা ছল-চাতুরী, লোক দেখানো হৃদয়হীন কৃত্রিমতায় পরিণত হইতে চলিল। যদ্বারা বিশ্বের কতকলোক পাইকারীভাবে ধর্ম ও ধর্মিকের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাসজনিত অনুমানে স্রষ্টার প্রতি সন্দিগ্ধ, অস্বীকারকারী এবং নাস্তিকতাবাদ সমর্থক বিভিন্ন ইজমের উৎপত্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম গোড়াবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ বিপজ্জনক এলাকার সৃষ্টি করিল। সূফী মতবাদ সেই দুর্গতির ভিতর দিয়া ধর্মগোড়াবাদের পরিবর্তে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সাম্য "আদলে মোতলাকের" প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। লোভী ছদ্মবেশীদের আবির্ভাবের ফলে তা বানচাল হইতে চলিল। যাহাতে বিশ্ববাসী ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইল। অলৌকিকতা-শূন্য এহেন নৈতিক পতন যুগে এক জন সার্বজনীন মহাপুরুষ, ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসে আ'যমের আবশ্যকতা পুনঃ প্রকট হইয়া দেখা দিল। যেহেতু সাধু বুজুর্গ এবং অসাধু বুজুর্গবেশী রূপধারীর পরিচয় জনগণের দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল; কাজেই খোদায়ী গুণজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন প্রতিভাবান বুজুর্গের আগমন প্রাকৃতিকভাবে অনিবার্য হইল। যাহাতে অলৌকিকত্ব ও দাবীর নিশ্চয়তা পুণঃ দেখা দিল।

যাহার ফলে হিজরী ১২৪৪ সালে সকল ধর্মাবলম্বীর ত্রাণ কর্তৃত্বসম্পন্ন খাতেমে জমানায়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা-আগত বিগত বেলায়েত যুগের সমন্বয় সাধক, বিশ্ব অলি রসূলে করিম (দ.) এর আহমদী বেলায়তের ধারক বাহক হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মালামিয়া কাদেরী (রা.)-এর অজুদে পাকে বেলায়তে মোতলাকার জন্ম লাভ সংঘটিত হইল। (পৃ.৬-৭)।

গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রা.) এর মত গাউসুল আ'যম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.)-ও প্রকাশ্যে গাউসিয়তের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, অন্য কোন বুজুর্গ এই গাউছে আযমীয়তের দাবী করেননি। এই দুইজন মহাপুরুষই কেবল "গাউসুল আ'যম" নামে সম্মানিত। গাউসুল আ'যম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.) বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর ঝাণ্ডা বরদার। যাহা হাশরের দিন শেষ নবীর ঝান্ডা- "লেওয়ায়ে আহমদী" হিসাবে উত্থিত হইবে। সুতরাং ইবনে আরবী (ক.) এর বাণী মতে তিনিই "খাতেমুল অলদ" এবং বেলায়তে মুহাম্মদীর খাতেমুল অলী নিশানধারী। (পৃ. ৯)।

মুসলিম আচার-ধর্ম

নামকরণের মধ্যেই এর আদর্শ উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নিয়মাবলীই এতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: নামাজের সূরা সমূহ, ১৩০ ফরজ, ৪ কুরসি, ৪ মজহাব, সপ্ত ঈমান, পঞ্চবেনা বিভিন্ন শ্রেণীর নামাজের নিয়মাবলী ইত্যাদি।

এরই পাশাপাশি পরিশিষ্টের যে বক্তব্য তা এর সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট যেমন– বর্ণিত ধর্মীয় নিয়ম পদ্ধতি ছাড়াও ধর্মাচারীর উচিত যে, প্রত্যেক নামাজের মধ্যেকার সময়ে মানসিক এবং দৈহিক তৎপরতা খোঁজ করা। যাহাকে সূফী পরিভাষায় "তেলাওয়াতে ওজুদ" বলে। যাহার ফলে ধার্মিক ব্যক্তিগতভাবে বুঝিতে পারিবে যে, সে সজাগ চিত্ত কিনা? মন এদিক ওদিক ধাবিত না হওয়ার জন্য অবসর সময়ে পীরের দেওয়া জিকির পাঠ করা প্রয়োজন।

এরই সঙ্গে যথার্থ পীর সংক্রান্ত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রা.)-এর রচিত যে কবিতা তা গভীরভাবে অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ সকলের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে, জান তিনভাবে
বাক বিতন্ডা পরিহারে
জানার আগ্রহে
পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে।
না দেখাইবে "পীর" যাকে
এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে
সেই পথ হারা। (পৃ. ২৭)

তাসাউফের প্রস্তুতি-পর্বের কাঠামোগত ধর্মজ্ঞান দানের জন্যে

এ পুস্তক রচনা বিষয়ে লেখকের যে বক্তব্য এবং এর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য–

আল্লাহ্ পাকের হেদায়ত ধারা রেছালত ও বেলায়ত দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর প্রাক যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে উক্ত হেদায়ত ধারাই হযরতের জাতে পাকে একত্রিত হইয়া মানব জাতিকে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগম করিয়া দেয়, যাহাতে রেছালতের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। পরবর্তীকালে হযরত (দ.) -এর দুই নামানুসারে "আহমদ" ও "মুহাম্মদ" তাৎপর্যে তাঁহার হেদায়ত ধারা ১. আচার-ধর্ম, ২. আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ভাব প্রবণতা) এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আচার-ধর্ম অবলম্বনে মানুষের বাহ্যিকরূপ সংগঠন করিতে সক্ষম হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে খোদাতালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের ফলে আচার-ধর্ম প্রাধান্যতা যখন শিথিল হইয়া যায়, সেই মুহূর্তে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাধান্যতা নিয়া যুগ সংস্কারক হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) কেবলা কাবা এই ধারাক্রমে আবির্ভূত হন। তিনি গাউসুল আ'যম হিসেবে মানব জাতির ত্রাণ কর্তৃত্বরূপে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগমার্থে "উসুলে সাবআ" বা সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যাহাতে সহজ উপাদেয় হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করত স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে।

ভাব প্রবণতা প্রাধান্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণকারীদিগকে রুচি দানের সাহায্যে "মূলতত্ত্ব" নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছি। কিন্তু মনে করিলাম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রুচি লাভে সমর্থ হওয়ার জন্য আচার-ধর্মেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে, তাই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর অনুসারীদিগকে আচার-ধর্মজ্ঞান দানের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা রচনা করিলাম। অতএব, কেন্দ্রীয়, জেলা ও শাখা দায়রা আঞ্জুমানগুলি এই আচার-ধর্ম, মূলতত্ত্ব ও বেলায়তে মোতলাকা শিক্ষা দানে হযরত আকদাছের প্রবর্তিত "উসুলে সাবআ" বা সপ্ত পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্ব মানবের হিতার্থে তুলিয়া ধরিলে শ্রম সার্থক মনে করিব। (ভূমিকাংশ)।

মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া

প্রথম সংস্করণে ২২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা, হাদিয়া: ০.৭৫ পয়সা। ২০০৪ এ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর প্রকাশনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এর দ্বাদশ সংস্করণ (২৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছে, হাদিয়া ১০.০০ টাকা। মাইজভাণ্ডারী পরিমন্ডলে এগুলো পাঠের প্রচলন এবং বাংলা ভাষায় এই রকম বই না থাকার কারণেই এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে।

গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) এর মাজার শরীফে ও দরবারী মাহফিলে প্রচলিত মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া এর এই সংকলনের উল্লেখযোগ্য বিষয় "জিকরী মাহফিল কানুন ও শরায়েত" বর্ণনা। এতে বারটি পূর্বশর্ত উল্লিখিত হয়েছে। তরিকতের নিজস্ব নিয়ম কানুন বর্ণিত হলেও এর ভূমিকাতে মাইজভাণ্ডারী তরিকা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তথ্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের জন্য মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে বলে পুরা ভূমিকাই উদ্ধৃত করা হল–

মাইজভাণ্ডারী তরিকা সমস্ত তরিকার সমাবেশ ও সর্বব্যষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, ছরওয়ারদীয়া, তৈপুরীয়া, জোনায়দীয়া ইত্যাদি তরিকা উহার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত তরিকত পন্থীরা মাইজভাণ্ডারী তরিকা মত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীর বুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব তরিকানুযায়ী জিকির করিয়া মাইজভাণ্ডারী (ক.) হইতে ফয়জ রহমত অর্জন করিবার অধিকার আছে।

এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী উপাসনা করিয়া মাইজভাণ্ডারী (রা.) হইতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জনের অধিকার আছে। কারণ ইহা কোন ব্যক্তিগত, জাতিগত, সাম্প্রদায়িক তরিকা নহে। মাইজভাণ্ডারী তরিকত পন্থী মুরিদ, ভক্ত আশেকগণও তাহাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের ছবক ও তালিকা অনুযায়ী যে কোন তরিকত পদ্ধতি অনুসারে জিকির করিবার অধিকার রহিয়াছে।

যাহারা ছেমায় আসক্ত, ছেমা বা গান-বাদ্যজনিত জিকির বা জিকিরী মাহফিল করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিকিরী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। (পৃ. ১)

হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শুভদৃষ্টি ও ফয়জ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপাবারী হাসেলের জন্য সেমা মাহফিলে নিম্নবর্ণিত নিয়মকানুন মেনে আদবের সাথে চলা বাঞ্ছনীয়।

১. "তাহারত" বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন: যেমন- অজু করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া।

২. মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন: যেমন জাগতিক ধ্যান বর্জন করত পীর মুর্শিদ ও আল্লাহর ধ্যান করা।
৩. স্ব স্ব পীরে কামেলের প্রদত্ত ছবক মত জিকির করা।
৪. কামেল পীর বা পীরের অনুমতি প্রাপ্ত খলিফাদের উপস্থিতি।
৫. পবিত্র কুরআনের আয়াত, দরুদ শরীফ ও মিলাদে নবী বা তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পাঠান্তে জিকিরী মাহফিল আরম্ভ করা।
৬. নামাজের কায়দা মত আদব ও শৃঙ্খলার সাথে বসা।
৭. ধূমপান বা যে কোন ধরণের পানাহার সম্পূর্ণ বর্জন করা।
৮. অংশগ্রহণকারী সকলকে তরিকত পন্থী হওয়া।
৯. কম বয়স্ক বালক-বালিকার উপস্থিতি ও মেয়ে পুরুষের একসাথে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা।
১০. মেয়ে লোকদের জিকির মাহফিল পুরুষ থেকে ভিন্নভাবে পর্দার মাধ্যমে করা।
১১. মাহফিল অবস্থায় অজদ প্রাপ্ত বেহুঁশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করা।
১২. জিকিরী মাহফিল নিজ অধিকারী জায়গায় হওয়া।

মানব সভ্যতা

অসি-এ গাউসুল আ'যম রচিত সর্বমোট ১২টি গ্রন্থ ও পুস্তিকার তালিকায় এটি সর্বশেষ রচনা। সূফিবাদের তথা সূফি সভ্যতার উৎপত্তি প্রশ্নে ও মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফতের স্বরূপ উল্লেখপূর্বক বিতর্কের উত্তর দানই এই পুস্তিকা রচনার মূল কারণ। মৌলিকভাবে এটি তাঁর বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থেরই অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তাঁর বর্ণনায়- বিভিন্ন গন্ডিমনন প্রকৃতির গবেষণাকারীর লেখনীতে সূফি সভ্যতার উৎপত্তিস্থল তালাস করিতে গিয়া কেহ ইহাকে খৃষ্টানসাধকধর্ম নির্গত, কেহ হিন্দুশাস্ত্র প্রকৃতি দিশারী প্রভৃতি বর্ণনা দেখিয়াই এই বইখানি লিখিতে মনোনিবেশ করিলাম।

নৈতিক মানবতা যেই নীতিকে ধারণ করিয়া বাঁচে বা রক্ষা পায় তাহার অপর নাম সূফি সভ্যতা বা নৈতিক মানবধর্ম। ইহা মোটেই দেশগত বা সমাজগত গন্ডিতে আবদ্ধ হইতে পারে না।

প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তু বাঁচিয়া থাকার একটি রীতিনীতি আছে। মানব সভ্যতা বাঁচিবারও নিশ্চয় একটি দিক নির্ণয়কারী রীতিনীতি আছে যাহা মানবতা। মানবতা দেশ ও জাতির গন্ডিমুক্ত। ইহা অভিন্ন।

[সত্যিকার অর্থে' সূফি মতবাদ যাহা সকল ধর্মে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি "খাহেসাতে নফছানীর কোরবানী" নীতিতে অভিন্ন। যদিও বিভিন্ন ধর্মে চলত ভঙ্গির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুগের চাহিদা মতে চলিতে দেখা গিয়েছে। কাজেই সূফি মতবাদ ইসলামিক বা অনৈসলামিক এই প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু "ইসলাম" আরবি শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ আনুগত্য গ্রহণ, যাহা বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর আনুগত্যকেই বুঝায়। সৃষ্টিমাত্রই সুক্ষাতিসুক্ষ মহান শক্তি আল্লাহ তা'আলার অনুগত থাকিতে বাধ্য। তাই প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু খোদায়ী আইন নিয়ম পালন করে, হুকুম মান্য করে যাহা ঐ মহাশক্তির ইচ্ছার বিকাশ রূপ।

যে কোন জাতি বা দেশী গণ্যমান্য মনীষী সাধক সিদ্ধ 'কামেল' পূর্ণ মানবতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পার্থিব কামনা শিথিল এবং স্রষ্টা মননচিত্ত মগ্নচেতনা পরিণামদর্শী সম্পন্নই দেখা যায়; যাহা সূফি সাধনার ফল। এই চিত্ত প্রকৃতি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর 'গারে হেরা' হইতে নবুয়ত যুগেও বারবার ব্যক্ত ও প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। রসূলুল্লাহর (দ.) পূর্ববর্তী হযরত খিজির (আ.), "আছহাবে কাহাফ" হযরত সোলায়মান (আ.) এর পরিষদ সদস্য "আছেপ", হযরত ঈসা নবী (আ.) ইত্যাদির পরে "সাহাবী জামানাতে" হযরত আলী (ক.) আসহাবে সুফ্ফা প্রভৃতি, তাবেইন যুগে যহরত হাসান বসরী (র.) এবং হযরত ওয়াইস করণী (র.) প্রভৃতি ক্রমে বসরা, কুফা, বাগদাদ, পারস্য ইত্যাদি স্থানে বহু সাধক মোসলেম ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে যাহা সনাতন ও অবিনশ্বর। কাজেই সম্প্রদায় বা দেশগত পার্থক্য টানার জন্য এই নৈতিক ধর্মে বিভেদ প্রচেষ্টা খাপছাড়া এবং অবাঞ্ছিত। যেহেতু এই নৈতিক ধর্ম তৌহিদী অদ্বৈত, জমআনী সমাবেশকারী বিভেদাত্মক নহে বরং বন্ধুভাবাপন্ন বিদ্বেষহীন।

কালের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে "নবুয়ত" বিধানগত আচার-ধর্ম হযরত আদম (আ.) হইতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) পর্যন্ত যেইরূপ ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়, শেষ নবীর প্রতি কুরআন পাকের বাণী- "আল এয়া উমা আকমালতো লাকুম দীনাকুম" প্রকাশ আছে, তদ্রুপ পূর্ণতার সন্ধানে বিভিন্ন সময় সূফি সভ্যতার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিকাশ মোটেই অস্বাভাবিক নহে; বরং প্রগতিমুখী ও স্বাভাবিক। যেমন মাওলানা রুমী বলেন-

কালের প্রসূত জ্ঞান সূফি সম্প্রদায়
প্রগতি পন্থী তারা নহে বিপর্যয়।

-ভূমিকাংশ ও পৃ. ১,২,৩

(চলবে)

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী •

বেলায়াত, সূফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুবী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুরদ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশতিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ আমরা উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি।

সুলতানুল মশায়েখের কলমে হযরত ওসমান (রাদ্বি.)ঃ হযরত আমিরুল মুমিনীন ওসমান বিন আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর উপর সালাম বর্ষিত হোক যিনি হায়া বা লজ্জার খনি, সূফি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোনীত পুণ্যবান এবং রেজা বা সন্তুষ্টির রাজ দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। (অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মহা তোরণের নিকটবর্তী হয়ে কোন মনীষী প্রবেশ করতে চাইলে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শরনাপন্ন হতে হবে– সিরাজী) তিনি হযরত ছরওয়ারে কায়েনাত, খুলাসা এ মওজুদাত নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা ছিলেন। কথাটা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই মহাত্মা কন্যার প্রতি ইঙ্গিতবাহী। এ কারণে তাঁর উপাধি ছিলো যুন্নূরাইন। (অর্থাৎ- দু'টি নূরের মালিক। কেননা নবী করিম (দ.) স্বয়ং আল্লাহর জাতী নূরের সৃষ্টি। তাঁর আওলাদ পুত্র-কন্যাগণ, বংশধরগণও নূরের মানুষ। ফলে রাসূলে পাকের কন্যাগণও নূর বিধায় দুই নূরের কর্তা বলা হয়েছে হযরত ওসমান গনী যুন্নূরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে। উল্লেখ্য যে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তাই তিনি ঐ বিরল উপাধি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। – সিরাজী)

তিনি ছিলেন জামিউল কুরআন বা কুরআন একত্রকারী। (অর্থাৎ - কুরআন শরীফ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেখান থেকে অনুসন্ধান করে তিনি কুরআনে করিমের পাণ্ডুলিপি একত্রিকরণ করেন। পশুর চামড়ায়, গাছের ছালে, পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল কুরআনের পাণ্ডুলিপি। এসব একত্রিকরণ করে তিনি ইসলামে এক অনন্য অবদান রাখেন এবং কিয়ামত অবধি জামেউল কুরআন অভিধায় ভূষিত থাকবেন। হাশর ময়দানেও ঐ অভিধা অমলিন থাকবে।– সিরাজী) তিনি অভুক্তদেরকে উদরপূর্তিকারী এবং ইসলামের অনুসারীদের সেনাদলকে শৃঙ্খলাবদ্ধকারী ছিলেন। নানা ধরনের নিয়ামত এবং আল্লাহর কৃপাদান দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। নম্রতার আভরণে আচ্ছাদিত ছিলেন। বহুবিধ জ্ঞানের সমাহারে প্রশংসিত ছিলেন। মিম্বরের উপর ভাষণদানকালে তাঁর বিনয়, লজ্জা-শরম আর নবীজির প্রতি ভয়ের কারণে তাঁর জবান থেমে যেত। ঐ মহাত্মার ফজায়েল বা গুণাবলী আর জীবন চরিত অতি প্রকাশ্য।

হযরত আবদুল্লাহ আবি রিবাহ এবং আবি ক্বাতাদাহ (রাদ্বি.) বর্ণনা করেন যে, আমরা যুদ্ধময় দেশে জুমার দিন তাঁর পাশে ছিলাম। তাঁর নিকট যখন যুদ্ধের শোরগোল পৌছল, তখন তাঁর ক্রীতদাসরা হাতিয়ার তুলে নিল। তখন আমিরুল মুমিনিন ওসমান (রাদ্বি.) বললেন- যে ব্যক্তি অস্ত্র উঠাবে না সে আমার সম্পদ থেকে মুক্ত। একথা শুনে আমরা তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত হাসান বিন আলী (রাদ্বি.) এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন যে, ওহে আমীরুল মুমিনীন আমি আপনার আদেশ ব্যতীত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে পারিনা। আপনি তো ইমামে বরহক বা প্রকৃত ইমাম। আপনি আমাকে হুকুম দিন যে, ঐ লোকগুলোকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেই। তিনি বললেন–

আধিক্যের কারণে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

انا مدينة العلم وعلى بابها

অর্থাৎ- আমি হলাম ইলম বা জ্ঞানের শহর আর আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হলেন সে শহরের দরজা। এ কারণে আমিরুল মুমিনীন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন: যদি আলী (রাদ্বি.) না হতেন তাহলে ওমর মরে গিয়ে ছিলো।

পবিত্র শবে মিরাজ বা মিরাজ রজনীতে ফক্বর বা বিলায়তের যে খিরক্বা বা পোশাক রাসূলে পাক (দ.) এর নিকট আল্লাহ তায়ালার দরবার থেকে প্রদান করা হয়েছিল, সে মহা মূল্যবান বেলায়তী পোশাকের দ্বারা ধন্য হয়ে ছিলেন শুধুমাত্র হযরত মওলা আলী শেরে খোদা (রাদ্বি.)। এ কারণে কিয়ামত বা মহা প্রলয় পর্যন্ত যত জন খিরক্বা পরিধানকারী আওলিয়া সৃষ্টি হবেন তারা সকলেই হযরত আলী (রাদ্বি.) এর মাধ্যমে ঐ বিলায়তী পোশাক প্রাপ্ত হবেন। আর এ ধর্মীয় কর্মটির উসীলা একমাত্র তাঁর জন্য স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত। এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খোদার জগতে একমাত্র তিনিই। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সীমাহীন উচ্চতর ও উন্নত। হযরত শেখ জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) ফরমান যে, আসল ও ইবতিদার মধ্যে বা প্রকৃতভাবে এবং প্রারম্ভে আমাদের শায়খ বা পীর-মুরশিদ ছিলেন হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

হযরত আলী (রাদ্বি.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সবচেয়ে উত্তম কর্ম কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন–

غناء القلب بالله

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আত্মিকভাবে দৌলতমন্দ বা ধনাঢ্য হবে না তার জাগতিক ধনাঢ্য না হওয়াটা তাকে দরবেশ বানাতে পারেনা। হযরত সুলতানুল মশায়েখ (ক.ছি.আ) এর হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে যে,

قال علی یوم الخیبر انا الذی سمتنی امی حیدرة کلیث غابت کرمت المباخرة او فیهم بالصاع کیل السندرة سمیته اسدا باسم ابیها وهی فاطمة بنت اسد وابو طالب غالب فلما قدم کرهه وسماه علیا الحیدر من السماء الاسد السندرة مکیا له کبیری الفلهم قتالا واسعا

অর্থাৎ- "খাইবার যুদ্ধের দিবসে হযরত আলী কররমাল্লাহু ওয়াজহাহু ইরশাদ করেন যে, আমি ঐ সত্তা হই যাঁর নাম আমার আম্মা রেখেছেন হায়দার, যার অর্থ হলো এমন শার্দুলের ন্যায় যে চলার সময় তার রুক্ষ স্বভাব ও বীরত্বের

یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک حتی یاتی الله بامره فلا حاجة لنا فی اهراق الدماء

অর্থাৎ- ওহে আমার ভাইপো তুমি ফিরে যাও, নিজের গৃহে গিয়ে অবস্থান কর, ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ আসে। আমাদের রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। এ ধরণের মনোবৃত্তিকে আহলে ছুলূক বা ত্বরীক্বতপন্থী বা আধ্যাত্মিক পথচারীদের পরিভাষায় মক্বামে রিদ্বা বা সন্তোষের স্তর বলা হয়। অতএব তিনি সে স্তরটি ধারণ করেছেন। তিনি দশদিন কম দশ বৎসর খিলাফত বা রাজত্ব করেছেন। পর্দা করার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। কোন কোন বর্ণনা মতে ৯০ বৎসর। শাহাদতের সময় তাঁর বগলে কুরআন শরীফ ছিল। বুধবার দিন নয়ার আয়াজ নামক এক আততায়ীর হাতে তিনি শহীদ হন। হাকীম সিনায়ী তাঁর প্রশংসাগীতিতে ফার্সী ছন্দে কসিদা লিখেছেন এভাবে–

آنکه بر جائے مصطفے باشد + بر لبش سم راه خطبه بست
ان ز لکنت نبود بود از شرم + زانکه انست جانش را از زم
عین ایمان که بود جز عثمان + محبت ایں که الحیاء من الایمان
دست مشاطه پسندیده + کحل شرمش کشیده در دیده
هم ز اسلاف بهتر آمده + در کنا شرف بر آمده
دل او با نبی موافق بود + نور جانش جمیع صادق بود
فتنه را که خاست در قصبش + ذوالارحام بود در عصبش
آں نزد بود فتنه و کینه + نز شت زنگی بود نه آیینه
خلق و عالم هر آنکه نیک بداند + همه در حسن هوائے خواند
در همه نیک بودنگی یافت + سوئے یاران خویشتن شتافت
زانچناں چونکه عصمش ازوے باخت + تسلیم خلوتے ساخت

সুলতানুল মশায়েখের কলমে মওলা আলী (রাদ্বি.)ঃ এবং আমীরুল মুমিনীন আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর উপর সালাম বর্ষিত হোক। যিনি রাসূলে পাক (দ.) এর চাচাত ভাই হন। যিনি খোদায়ী পরীক্ষা সমুদ্রে নিমজ্জিত প্রেমের আগুনে ভস্মিভূত আওলিয়া এ কিরামের আমানায়ক, শাহেনশাহে বেলায়ত, বিশ্ব সূফি সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন। বদান্যতা, দানশীলতা, যুদ্ধ, জিহাদ, উপবাস যাপন, সূফিবাদ ও আধ্যাত্মিকতায় সমগ্র সাহাবায়ে কিরাম এর মধ্যে হতে তিনি ছিলেন অতীব উত্তম ও অভিজাত ব্যক্তি। শক্তি ও বীরত্বের কারণে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আসাদুল্লাহিল গালিব বা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার সিংহ উপাধি দান করেছেন। বিদ্যা ও জ্ঞানের

ফলে রাস্তাকে পর্যন্ত দৃষ্টিতে নেয়না। সে এমন সিংহ যে ব্যাঘ্রকুলের উপরও বিজয়ী হয়। বাঘের উপরে বাঘ। আমি তাদের হক বা প্রাপ্যকে তুলাদন্ডে বিচার করে আদায় করে থাকি।

তাঁর আম্মাজান তাঁর পিতার নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর নাম করণ করেছেন। কেননা তাঁর পিতার নামও ছিল আসাদ। আবু তালেব ঐ সময় ঘরে ছিলেন না, যখন ঘরে ফিরে পুত্রের নাম আসাদ রাখার কথা শুনলেন তখন ঐ নামকে অপছন্দ করলেন এবং তিনি স্বয়ং নাম রাখলেন আলী হায়দার। সন্দরা বড় পাল্লাকে বলা হয়ে থাকে। আমি কাফিরদেরকে অধিক হারে কতল করে দিই। সে হিসেবে আমার খোদাদ্রোহী নিধনকারী অর্থবোধক নামটিও উল্লেখ যোগ্য।"

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধের দিন হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উটের পিঠের আসনের নিকটে যখন হযরত আলী (রাদ্বি.) এসে পৌঁছলেন এবং তাঁর সাথে বিনয় ও নম্র ভাষায় আচরণ করলেন; তখন তিনি বললেন– তুমি বাদশাহকে কতল করেছো। অতঃপর হযরত আলী (রাদ্বি.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) এর সাথে চল্লিশজন মহিলা সহযাত্রী করে দিলেন। এতে মা আয়েশা (রাদ্বি.) এসে মদীনা শরীফে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাঁর বয়স ছিল তখন ৬৩ বৎসর। আবদুর রহমান মলজম যে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষাবলম্বী হয়ে গিয়েছিল সে কমবখ্‌ত মলজম হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর নামাজরত অবস্থায় বিষ মিশ্রিত বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। তার তিন দিন পর জুমার দিবসে ১৭ রমযান হিজরী ৩০ সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন। খাজা সিনাই এই খলীফা-এ- বরহক এর প্রশংসায় ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করেন, তা নিম্নরূপ–

قصیدہ

اے سنائی بقوت ایمان + مدح حیدر بگو لیش از عثمان
بامدحش مدائح مطلق + زہق الباطل است وجاء الحق
آں فضل آفت سرائے فضول + آں علم وارد علم وار رسول
ہم سنی راوصی وہم داماد + چشم پیغمبر از جمالش شاد
آمد از سدرہ جبرئیل امین + لافتح کرد مرد را تلقین
شرف ملک وواید دین او + صدف درّ آل یاسین او
آل یاسین شرف بدہ دیدہ + ریز داور ابعلم بگزیدہ
بہر او گفت مصطفے بہ الہ + کہ خداوند وآل من وآلہ
راز دار خدا و پیغمبر + راز دار پیغمبر آں حیدر
کاتب نقش نامہ تنزیل + خازن گنج نامہ تاویل
لفظ قران چو دید در ویشش + خویشتن جلوہ کرد در ویشش
عشق را بحر بود ودل را کان + شرع را دیدہ بود ودین را جاں
کدخدائے زمانہ چاکر او + خواجہ روزگار قنبر او
از پئے سائلے بیک دو رغیف + سورہ ہل اتی در اتشریف
مرتضائے کہ کردہ پر دانش + ہمرہ جان مصطفے جانش
ہر دو یک کعبہ وخروشاں دو + ہر دو یک روح وکالبد شان دو
ہر دو یک درّہ یکصدف بودند + ہر دو پیر یہ دشرف بودند
دور وندہ چو اختر وگردوں + دو برادر چو موسی وہارون
دل او عالم معانی بود + لفظ آداب زندگانی بود
عقد او با بتول ماسلوے + بود در زیر سایہ طوبے

সূফি উদ্ধৃতি

■ তিনটি কাজ মানুষের বড় বিপদ ডেকে আনে, যথাঃ ১. সম্পদের লোভ, ২. মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা এবং ৩.সবার নিকট গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় হওয়ার বাসনা।

■ পার্থিব আমোদ উৎসব আল্লাহকে খুশী রাখার চিন্তাকে মন থেকে দূর করে দেয়।

■ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ভয় ও তাঁর রহমতের আশা অন্তরে বিরাজমান থাকাই ঈমানের লক্ষণ।

– হযরত আবু ওসমান হীরী (রাহ্)

যথার্থ সহায়ক শক্তি

• মুহাম্মদ ওহীদুল আলম •

মানুষ নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারেনি। গোটা সৃষ্টিই অস্তিত্বে এসেছে মহান কুশলী এক স্রষ্টার ইচ্ছায়। তিনি হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন, সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রতিপালক। যিনি সৃষ্টি করেন স্বাভাবিকভাবে মালিকানাও তাঁর আর যিনি মালিক প্রতিপালনও করেন তিনি। দুনিয়াতে মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু উপকরণই সৃষ্টি করেন নি, মানুষকে এ সব ব্যবহারের কৌশলও শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি। জীবন যাপনের উপকরণের সাথে উপযুক্ত একটি পরিবেশও দিয়েছেন তিনি। সৃষ্টির মাঝে তিনি রেখেছেন তাঁর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন।

এ নিদর্শনগুলো অবারিত হয়ে আছে মানুষের চোখের সামনে। কিন্তু কপালের নীচে একজোড়া চোখ থাকলেই এ সকল নিদর্শন দেখা যায় না। বুদ্ধি, অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে এ সকল নিদর্শনের তাৎপর্য বুঝে নিতে হয়। এ সব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেই শুধু একজন মানুষ বলতে পারে, "হে আমাদের প্রভু, এ সবের কিছুই তুমি বৃথা সৃষ্টি করোনি।"

যে মানুষ এ উপলব্ধিতে উপনীত হতে পারে তার পক্ষেই শুধু সম্ভব আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর বন্দেগী বা ইবাদতের এটাই পূর্বশর্ত। আর জ্বিন ও ইনসানকে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি।

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের সৃষ্টি হওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই জানতে পারেনি। তাই তাদের জীবন হয়ে পড়েছে 'খাও দাও ফুর্তি কর' ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সীমাবদ্ধতা তাদের জীবন দৃষ্টিকেই সংকীর্ণ করে দিয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর কোন বিশেষ তাৎপর্যই তাদের চোখে ধরা পড়েনা। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করে দিতে চান কারা সৎকাজ করে এবং কারা এ থেকে বিমুখ হয়। সৎকাজ ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। কল্যাণকর সমাজের জন্যও। পক্ষান্তরে মন্দকাজে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজের কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু সে সবসময় পরিনামদর্শী নয়। অনেক হিতকর জিনিষকে সে প্রত্যাখ্যান করে, অনেক সময় অকল্যাণকর বিষয়কে সে স্বাগত জানায়।

কিসে মানুষের কল্যাণ ও কিসে অকল্যাণ তার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহরই কাছে। নিজের কল্যাণ হবে ভেবে মানুষ আল্লাহর কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করে। অনেক সময় তা কবুল হয় না দেখে তারা হতাশ হয়। মানুষের অকল্যাণ ঘটতে পারে বলেই তিনি বান্দার প্রার্থনাকে অপূর্ণ রাখেন কিন্তু তা বাতিল করে দেন না। বস্তুত মু'মিনের প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক। এমন হতে পারে যে, একজন বিশ্বাসী মানুষ অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ছে অথচ বিপরীত দিকে মহা প্রভু তখন তার গোনাহ মার্জনায় রত আছেন। অবিশ্বাসী মানুষও যেমনি রোগগ্রস্ত হয় আবার আরোগ্য লাভও করে। কিন্তু সে জানেনা কী কারণে একসময় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কেনই বা তাকে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মু'মিনের প্রার্থনার বিষয়টিও একই রকম। কোন কোন প্রার্থনা দ্রুত কবুল করা হয়, কোন কোন প্রার্থনার ফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। আর যে সব প্রার্থনা দুনিয়াতে কবুল হয় না সে সবের ফল আখিরাতের জন্য জমা রাখা হয়। এ যেন চাকুরীজীবীদের বেতন থেকে কেটে রাখা ভবিষ্য তহবিলে (Provident Fund) জমাকৃত অর্থ। আর আল্লাহ চাইলে এর পরিমান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। এ জন্যই একজন বিশ্বাসী মানুষ মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা পেশে কখনো ক্লান্তি বোধ করেনা।

ক্লান্তি হীন প্রার্থনার এ মনোভাব মানুষকে অনেক গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছে। সূরা ইয়াসিনের ৬১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন ঃ **আমার ইবাদত কর, ইহাই সরলপথ। (আনি'বুদুনী হাজা সিরাতিম মুসতাকিম)**
বুঝাই যাচ্ছে, যে মানুষ প্রার্থনা বিমুখ সে অবশ্যই সরল পথ হারায়। আর পথহারা মানুষের নিয়তিই হল বিভ্রান্তির উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো। আর বিভ্রম তো এমন এক গোলকধাঁধা যা কখনো সন্ধান দেয় না গন্তব্যের।

তাই মানুষের প্রভু পরম মমতায় মানুষকে ডেকে বলছেন **"মা গার্‌রাকা বিরাব্বিকাল করীম।"– হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রভুকে ছেড়ে কোন দিকে ছুটে চলেছ?**

আজ সারা পৃথিবীর মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে শুধু ছুটাছুটি করেই মরছে। তাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে পড়েছে দু'টোতে সীমিত: **অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা**। আর এ দু'টো অর্জনের পথ হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতা শূন্য। প্রতারণা ও নির্মমতার নিকৃষ্ট যত উপায় ও প্রকরণ আছে সবগুলোই অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে ব্যয়িত হয়। এরমধ্যে আবার ক্ষমতা অর্জনের লোলুপতা সব চেয়ে তীব্র। কারণ এ ক্ষমতাই সম্পদ লুণ্ঠনের সমস্ত পথকে অবারিত করে দেয়। আজ পৃথিবী ব্যাপী সকল ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিপক্ষকে অক্ষম করে দেয়ার অভিযানে। এ অভিযান মোটেই নীরিহ কোন অভিযাত্রা নয় বরং সর্বাংশে সাঁড়াশি। সর্বগ্রাসী এ আক্রমণকে যৌক্তিকতার মুখোশ পরানোর উদ্দেশ্যে তারা ক্ষমতার কিছু অংশকে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ সৃষ্টির কাজে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে। মিডিয়ার কল্যাণে তারা সে কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে ভয়ানক এক দানব রূপে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। প্রহসনের বিষয় এই যে, তারা আবার নিজেরাই সেই প্রতিপক্ষের মুখপাত্ররূপে দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করে। কথিত সে প্রতিপক্ষের কোন বক্তব্য সরাসরি অন্যরা শুনতে পায় না। তারাই কথিত সে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের অপকর্মের কথা বলে বেড়ায় আর নিজেদের মানবতাবিরোধি কর্মকান্ডের সাফাই গায়। প্রতিপক্ষ 'আক্রমণ করতে পারে' একথা বলেই নিমিষেই তারা হাজার হাজার নারী শিশু সহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে ফেলে। তারা বলে, তারা নাকি গণতন্ত্রকে সংরক্ষণ করে চলেছে। মানুষকে অধিকার হারা করে কোন গণতন্ত্র তারা কায়েম করে আল্লাহ মা'লুম। মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে কোন মানবতার উদ্বোধন তারা ঘটাতে চায় তা বলা মুশকিল।

শয়তানের স্পর্শ যাদেরকে পাগল করে দিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে মানবতার এমনতরো অবমাননা সম্ভব নয়। হতভম্ব মানুষের সামনে মূল্যবোধের এমন নির্মম লুণ্ঠন আর কখনো এত ব্যাপকভাবে ঘটছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। সভ্যতা-গর্বী ক্ষমতাদর্পী এসব মানুষ দায়িত্বশীলতার সকল সবককে বেমালুম ভুলে গেছে। শুধু ক্ষমতার লালন নয় মমতায় পালনও যে, মানুষের কর্তব্যের অংশ হতে পারে এ নির্দেশনামা তাদের নোট বুকের কোন পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও দাপটের বলয়কে বিস্তৃত ও গভীরে প্রোথিত করার কায়দা কানুন ও হিসাব নিকাশে নিঃসন্দেহে তারা সুনিপুণ কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণকারীর দরবারে উপস্থিত হবার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তারা বেপরোয়াভাবে উদাসীন। মহান আল্লাহ বলেন: **মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন। অথচ তারা গাফলতে পড়ে আছে!** এ গাফিলতি মানুষের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এ বিষয়ে সকল মানুষ সমভাবে সচেতন নয়।

ইসলামের সার্বক্ষণিক প্রয়াস হচ্ছে অচেতনকে সচেতন করে তোলা। নিদ্রিতকে জাগ্রত করে দেয়া। জাগ্রতকে সক্রিয় করা, সক্রিয়কে সৎকর্মশীল করা, সৎকর্মশীলকে রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) মুক্ত করা। নিষ্ক্রিয়তা আর সক্রিয়তা এক কথা নয়, সদাচার কদাচারও এক জিনিষ নয়।

সদাচার-বিশিষ্ট, কলুষ-মুক্ত মানুষই প্রভুর সামনে নিজেকে পেশ করার উপযুক্ত। মানুষের জন্য এ যোগ্যতা অর্জনের পক্ষে ইসলামই হচ্ছে যথার্থ সহায়ক শক্তি।

সূফি উদ্ধৃতি

- আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা– (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় নম্রতা।"
- আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।"
- সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।"
- হায় কত ভাল হত! যদি মানুষ নিজেকে নিজে চিনতে পারত! নিজেকে নিজে চিনতে পারলে তার পূর্ণ মারিফাত হাসিল হয়।"

–হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)

পূর্ণ মানবীয় সত্তা আল-ইনসান আল কামিল

• এ. এন. এম. এ. মোমিন •

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে আল ইনসান-আল কামিল বা পূর্ণ মানুষের (Perfect man) এর ধারণা (Concept) সর্বপ্রথম শায়খ-উল আকবর ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০) প্রবর্তন করেন। তবে বিশ্ব আধ্যাত্মিক সাহিত্যে এই ভাবধারার উপস্থিতি আদম (আঃ)'র সৃষ্টি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করেন যে, "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিস্তাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।" (সূরা বাকারা-৩০) আল্লাহর 'প্রতিনিধি' হিসাবে মানুষের ক্ষমতা, মর্যাদা, সম্মান ও সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানবীয় চরিত্রের যে পূর্ণাংগ রূপে মানুষকে অভিষিক্ত করা হয়েছে সেটি পূর্ণ মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। হযরত আদম (আঃ)কে সেই ঐশী চারিত্রিক গুণাবলী দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। যা আদমের মর্যাদা, জ্ঞান ও ক্ষমতার ভিত্তি। এ কারণেই হযরত আদম (আঃ)কে নবীরূপে নির্বাচন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সকল নবী-রসূলই আল-ইনসানে কামেল। এই রূপের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশিত-বিকশিত রূপ বা বৈশিষ্ট্য আমরা হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র মধ্যে দেখতে পাই। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এই প্রকাশিত রূপকে "আল্লাহর রং" হিসাবে উল্লেখ করে এই গুণ, শক্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ (দ.)কে আল ইনসান-আল কামিল এর মডেল বা আদর্শ হিসাবে বিশ্ববাসী জেনে ও মেনে আসছে। সূফিতত্ত্ববিদগণ হযরত আদম (আঃ) এর বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আগমনকে আল্লাহ্ থেকে তাঁর সম্পর্কের সাময়িক বিচ্ছিন্নতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর সাথে মানবের পূণঃসংযোগ স্থাপন করে আল্লাহর মধ্যে নিজেকে বিলীন করার মাধ্যমেই এই পূর্ণাংগতা অর্জনকেই সকল মানবীয় ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ থেকে মানবজাতির জন্য হেদায়েতের প্রক্রিয়া একটি চির বহমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এরই অংশ হিসাবে নব্যওতের যুগের পরে বেলায়েতী যুগ যা হযরত আলী (রাঃ)'র মাধ্যমে শুরু হয় এবং ওলী মুর্শেদের মাধ্যমে এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এ বিষয়টি হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে প্রেরণের সময়ই সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, এরশাদ হচ্ছে, "আমি বলিলাম! তোমরা বকলেই এই সৃষ্টি হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।" (সূরা বাকারা - ৩৮)

এ কারণেই সূফি সাধকরা হচ্ছেন নবী- পরবর্তী যুগের হেদায়েতের ধারক ও বাহক। তাঁরাও ইনসানে কামিল হিসেবে বিবেচিত। সূফিগণ বলে থাকেন যে আওলাদে আদম হিসাবে সকল মানুষকেই ইনসানে কামিল হওয়ার যোগ্যতা দান করা হয়েছে যিনি তা অর্জন করতে সক্ষম হন তিনিই প্রকৃত ভাগ্যবান।

হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী তাঁর ইনসান আল কামিল মতবাদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ২২টি টার্ম (Term) বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন তার মধ্যে সত্যের মহাসত্য মুহাম্মদ (দ.)'র বাস্তবতা তথা প্রকৃত তাৎপর্য। আল্লাহর খলিফা হিসাবে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান, মর্যাদা ও শক্তি, হেদায়েতের ধ্রুব নক্ষত্র। তাই আল ইনসান-আল কামিলের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা এমন একজন মহা ব্যক্তিকে বিবেচনা করতে পারি যিনি আল্লাহর একত্বের মধ্যে তাঁর মানবীয় সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আর যারা এই মর্যাদায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাদেরকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় ওলীয়াম মুর্শেদ (কাহফ - ১৭) বা আল্লাহর বন্ধু ও আমাদের অভিভাবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সূফিবাদ প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধারার প্রচার, প্রকাশ ও প্রসার ঘটায়। এ কারণেই সূফিবাদের মূল শিক্ষা হলো একজন আদর্শ মানুষ (ইনসান আল কামিল) তিনি যিনি পূর্ণরূপে আল্লাহর চরিত্র অর্জন করতে পেরেছেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সূফিগণ পবিত্র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ অর্জনের প্রতি সর্বাত্মক জোর দিয়ে থাকেন। এক কথায় সূফিগণ তাঁদের অনুসারীদের কুরানিক চরিত্র অর্জনের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারীও বলেছেন- আমাকে বুঝতে হলে কুরআন দেখ। যেমন রসূল (দ.) এর চরিত্রকে "জীবন্ত কুরআন" হিসাবে ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল ইনসান-আল কামিল মতবাদে মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক

সাধারণভাবে আল্লাহকে একজন মহাশক্তিদাতা ও পরাক্রমশালী 'রাজাধিরাজ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ফলে মহা প্রেমময় আল্লাহতা'লার স্রষ্টা ও পালনকর্তা রূপ অজ্ঞানতার অন্ধকারেই ঢাকা পড়ে গেছে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুধুমাত্র একপক্ষীয় ইবাদত হিসাবে বর্ণনা করে আল্লাহকে মানুষের "পরম আপন সত্তা" তা ভুলিয়ে দেওয়ায় হয়েছে।

এই মতবাদে মানুষের মধ্যে আল্লাহর মহান চরিত্রের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা হয়। তাই মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে সেই "মহান সত্তা" সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মানুষকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আল্লাহর ঐশী চরিত্র ও মানবীয় চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

মানুষ আল্লাহর নিকট থেকে তার জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁর মাধ্যমেই জীবিত থাকে। আল্লাহতা'লার ঐশী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে চার ভাগে বিভাজন করা যায়- সৌন্দর্য মন্ডিত ক্ষমতা, রাজসিক ক্ষমতা, পূর্ণাংগতা অর্জনের ক্ষমতা ও মূল বা মহাসত্য অর্জনের ক্ষমতা। কোন মানুষ "ইনসানে কামিলে" উন্নীত হলে তিনি সকল ঐশী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহকে পরিণত হন। যাঁরা এই মর্যাদায় আধষ্ঠিত হন তাঁরা "বিশ্ব রক্ষক" তথা বিশ্বঅলী বা শাহান শাহ্ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত, ভূষিত হন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো আল্লাহতা'লারই গুণাবলী যা এই সব মহান বান্দাদের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লার সুন্দর সুন্দর নাম (আসমা-আল হুসনা) বর্ননা করা হয়েছে। সাধারণভাবে আল্লাহতা'লার ৯৯টি নামের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে একে আক্ষরিক অর্থে নেয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের সংখ্যা ৯৯টির বেশী। আল্লাহতা'লার সাধারণ নাম ও বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে রয়েছে পরম দয়ালু, মহা শক্তিশালী, ইচ্ছাময়, স্রষ্টা, পালনকর্তা, গোনাহ মাফকারী, মহা প্রেমময়।

আল ইনসান-আল কামিল মতবাদে রসূল (দ.)'র সাথে আমাদের সম্পর্ক

সাধারণভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠি হযরত মুহাম্মদ (দ.)কে ইনসানে কামিল হিসাবে বিশ্বাস করে থাকে। সুফিগণ বিশ্বাস করেন যে, যদি তাঁরা রসূল (দ.)কে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন তাহলে তাঁরা এমন এক আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছুতে পারবেন যেখানে রসূল (দ.) এর সন্তুষ্টি নিহিত আছে। সুফি-সাধকগণ আরো মনে করেন যে, পয়গম্বর ও আউলিয়াগণ জীবিত অবস্থায় আল্লাহর ঐ নৈকটে অধিষ্ঠিত হতে পারেন যেখানে থেকে আদি-আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর মানবীয় পতন যে স্তর থেকে শুরু হয়েছিল তার পূর্ব অবস্থায় তাঁরা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে পৌছাতে সক্ষম হতে পারেন। সে কারণেই তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (দ.)কে প্রধান উদাহরণ হিসাবে বিবেচনাপূর্বক তাঁর মহান সত্তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে চান। এ কারণেই মুহাম্মদ (দ.) আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একজন অনন্য আদর্শ। যিনি সবার অনুসরণযোগ্য। পবিত্র কুরআনে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টকে জীবন্ত আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের সাথে রসূল (দ.)'র সম্পর্ক আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও ছাত্রের মত তথা মুর্শীদ ও মুরীদের মত। তাই ইনসান আল কামিল হতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম রসূল (দ.) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনী গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র জীবনের কথা কার্যক্রম যত বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ এত সম্প্রসারিতভাবে জানার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। যিনি পূর্ণ মানুষের (Perfect man) পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি অন্যদের আধ্যাত্মিক গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

এই মতবাদের মানবীয় ব্যবহার

আল ইনসান-আল কামিল মতবাদের সাথে সুফি মানসের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। যাকে আত্ম সাধনার বিজ্ঞান বা "আত্মার সুফি বিজ্ঞান বলা হয়" সুফিদের ধারণা আল্লাহ্ থেকে বান্দার বিচ্ছিন্ন হওয়াই মানবের সকল প্রকার অশান্তির

ও দুঃখ দুদর্শার মূল কারণ।

ইসলামী আধ্যাত্ম দর্শনে বলা হয় যে, সকল মানব আত্মার উৎসস্থল হলো জান্নাত-বেহেশত, স্বর্গ। এ কারণে মানবীয় চরিত্রের গভীরে এই স্বর্গ সুখ সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। আল্লাহর নবী-আউলিয়াগণ এই বিষয়ে সাধনা করে সেখানে পৌছে যান। এ কারণেই সুফিতাত্ত্বিকগণ বিশ্বাস করেন যে, এই পর্যায়ে যাঁরা উন্নীত হন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক বা Standard আর যারা তা নন তারাই অনুন্নত বা (Sub-normal) অন্যান্যরা 'অসুস্থ'। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে যে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে তারা মুক্তি পান নি অর্থাৎ অসুস্থই রয়ে গেছেন। এক কথায় স্রষ্টার সাথে পুনর্মিলনের মধ্যেই সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। এ কারণেই মানবজাতির সদস্য হিসাবে প্রত্যেককেই এসব ঐশ্বরিক গুণাবলী অর্জন করতেই হবে। কারণ মূলত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এটাই। কিছু সংখ্যক সুফি বিবেচনা করেন কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তিই "ইনসানে কামিল" বা হেদায়েতের ধ্রুব নক্ষত্র তথা আল্লাহতা'লার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তিনি অদৃশ্য বা অপরিচিত হিসাবে থাকেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে "আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী। (সূরা ইউসুফ - ৭৬)

ত্রয়োদশ শতকের সুফি তাত্ত্বিক আজিজ নাসাফি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক ইনসানে আল-কামিল এ লিখেছেন যে, যিনি ইনসান আল-কামিলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তিনি চারিটি বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেন তাহলো- সৎকর্মশীলতা, সৎকর্ম সম্পাদন, সদ্ব্যবহার ও প্রকৃত সত্য দর্শন তথা অন্তর্দৃষ্টি লাভ।

নাসাফির ধারণা মতে একজন ইনসানে কামিল বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহতা'লার উদ্দেশ্য ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত হন এবং আল্লাহর সৃষ্টি পশু-পাখি, গাছ-পালা, উদ্ভিদ, পাথর সবকিছুর সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম কারণ প্রকৃতির সকল দিক ও বিভাগের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ব হয়ে থাকে। এই ধরণের মহান ব্যক্তি, সময়, স্থান, কালের উর্ধে বিচরণ করে থাকেন। এই মহান ব্যক্তিবর্গ মানসিক দিক থেকে ভয়, লোভ, আক্রমণাত্মক গুণাবলী, নফস বা প্রবৃত্তির সকল প্রকার বিপথগামিতা থেকে মুক্ত বা স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বাধীন নয় বরং নফসের বা প্রবৃত্তির তথা লোভ, কাম, ক্রোধ, ক্ষমতা, অর্থের আকর্ষণের অধীন। একারণেই কামিল ইনসান প্রকৃতপক্ষে পার্থিব ও মানবীয় দূর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। তিনি মানবীয় দূর্বলতা, দারিদ্র, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি সীমাহীন আস্থা অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত পূর্ণতা লাভ করেছেন।

উপসংহার:

সকল মানবের মধ্যে ইনসানে কামেল হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে এটা সঠিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খুব কম সংখ্যক লোককেই এই যোগ্যতা অর্জন করতে দেখা যায়। আল্লাহর নবী-রসূল ও আউলিয়াগণকেই এই ব্যাপারে সফলকাম হতে দেখা যায়। এই মতবাদ বা দর্শন মানব সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যমান যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বিষয়টি সুগভীর। এটি আল্লাহর বিশেষ ঐশ্বরীক জ্ঞান-এলমে লাদুনির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে ইনসানে কামেল হওয়ার তৌফিক দিন। আমিন।

ঢাকার সম্মানিত পাঠকদের জন্য সুসংবাদ

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে এখন থেকে ঢাকাস্থ খানকাহ্ শরীফে **মাসিক আলোকধারা** নিয়মিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানা:

'বাইত উল আসৃফিয়া'

মাইজভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ, খাদেম বাড়ী, ৩য় তলা, বাড়ী # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা- শাহ আলী, মিরপুর, সেকশন-১, ঢাকা-১২১৬)।

যোগাযোগ: 01716-655583 **(খাদেম)**

E-mail: baitulashfia@gmail.com

ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-০৮

• সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান •

তওবার মোকাম: তওবা বলতে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা, কুকর্মের পথ হতে সুকর্মের পথে ফিরে আসাকে বুঝায়। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য তওবা করা অপরিহার্য। তাই কোন ব্যক্তি তরিকতপন্থা এখতিয়ারের ইচ্ছা পোষণ করলে কামেল পীর মুর্শিদ তাকে প্রথমেই তওবার শিক্ষা ও দীক্ষাই প্রদান করেন, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। তবে কেবলমাত্র মুখে মুখে তওবার কলেমা পাঠ করলেই তওবা হয় না, বরং আন্তরিকভাবে অনুশোচনার মন নিয়ে পাপকর্ম হতে প্রত্যাবর্তন করাই হল প্রকৃত তওবা। আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন– "তোমরা তওবা কর আল্লাহর কাছে, আন্তরিক তওবা।" (সূরা তাহরীম, আয়াত ৮) এখানে আন্তরিক তওবার (তওবাতুন নছুহা) হুকুম রয়েছে। আন্তরিক তওবা হল সেই তওবা যার মাধ্যমে যে কাজ থেকে তওবা বা প্রত্যাবর্তন করা হয়, জীবনে আর কখনও সেই কাজে ফিরে না যাওয়া। আর এ ধরণের তওবাই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও মকবুলিয়তের নিদর্শন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "আর তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।" (সূরা শুরা, আয়াত-২৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "গুনাহ থেকে তওবাকারী এমন যেন তার কোন গুনাহই নেই।" রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "পাপ কাজ থেকে তওবা করে পুনরায় কখনও সে পাপের নিকটবর্তী না হওয়াকেই তওবা বলে।"

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন, "হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন 'যারা ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়েছে এবং পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে' (সূরা আনআম, রুকু ২০) এ উক্তিটি বেদ'আতীদের প্রসঙ্গে হয়েছে। প্রত্যেক পাপীর তওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন, কিন্তু বেদআতীর তওবা কবুল করবেন না, কেননা তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তারাও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট।"

কাফির, ফাসিক বলতে সেসব লোকদের বুঝায় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে গোমরাহী এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আর ফাজির, ফাসিক বলতে তাদের বুঝায়, যারা মদ্যপায়ী এবং রোযগারে হালাল হারামের তোয়াক্কা করে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহর নাফরমানী অবাধ্যতায় ডুবে থাকে। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী পরিহার করে আকণ্ঠ পাপাচারে ডুবে থাকে। কিন্তু এসবের পরও সে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় না। উল্লেখিত দু'ধরণের ফাসিকের মধ্যে পার্থক্য হল প্রথম প্রকার কাফির-ফাসিক ঈমান না আনা পর্যন্ত হাজার অনুশোচনা করলেও ঈমানের কোন আশা নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার ফাজির-ফাসিক মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম থেকে তওবা অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হলে আশা করা যায় সে ক্ষমা পাবে।

বস্তুত, লোভ লালসা ও কাম তাড়িত ব্যক্তির তাওবা সহজে নসীব হতে পারে, কিন্তু অহংকার ও আত্ম গৌরবের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়ত সহজে ভাগ্যে জোটে না। তওবা হচ্ছে কলবের একটি প্রক্রিয়ার নাম। তওবার শর্ত চারটি- প্রথম শর্ত, গুনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করবে যে, কিছুতেই আর এ গুনাহতে লিপ্ত হবে না। নিজের এ মতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, যে ধরণের গুনাহ পূর্বে হয়ে গেছে, তা থেকেই তওবা করবে। যে গুনাহতে কখনো লিপ্ত হয়নি তা থেকে তওবা করলে তাকে তওবা বলা হবে না। এ ধরণের তওবা কারীকে মুক্তাকী বলে পরিগণিত করা হবে। তৃতীয় শর্ত, এখন যে গুনাহতে লিপ্ত হওয়াকে পরিত্যাগ করছে, তার দ্বারা আগে যা সাধিত হয়েছে তার গুরুত্ব ও মরতবা সমান হতে হবে, আকৃতিগত সামঞ্জস্য থাকলেই চলবে না। যেমন– একজন ব্যক্তি যিনা ও ব্যভিচার থেকে তওবা করতে চায় কিন্তু এই সময় তার যিনার ক্ষমতা নাই। সে ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই যিনা-ব্যভিচার তৎসাথে এরূপ গর্হিত কাজের সমান গুনাহ যেমন– মিথ্যা অপবাদ, গীবত, চোগল খোরী এসব থেকেও তওবা করতে হবে।

চতুর্থ শর্ত আল্লাহর মহত্ব উপলব্ধি, তাঁর অসন্তুষ্টি ও ভয়াবহ আযাব থেকে পরিত্রাণই গুনাহ থেকে বিরত থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া চাই। দুনিয়ার কোন লোভ, সামাজিক ভয় বা সামাজিক শাস্তির আশঙ্কা কিংবা নফসের দুর্বলতা বা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য অথবা ফকিরী কারণে করলে হবে না। এগুলো তওবার শর্ত ও আরকান। সুতরাং এসব পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত ও পূর্ণাঙ্গ হাসিল হলেই বুঝতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই খাঁটি তওবা। হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভাষণ দান কালে বলেন, হে লোক সকল, মৃত্যুর পূর্বে তওবা কর। নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও।

সৎ লোকে পরিণত হও। তোমার ও তোমার প্রভুর মধ্যকার সম্পর্ককে গ্রথিত করে। বেশী পরিমাণ দান খয়রাত কর। তাতে আল্লাহ তোমাদের আয় রোযগারে বরকত দান করবেন। লোকদেরকে উপদেশ দান কর। আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। অসৎ কাজে বারণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আইনিস্তাগফির রাব্বাকুম ছুম্মা তুবু ইলাইহি (তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর।) এই আয়াত নাযিল হলে তখন হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, হে প্রভু! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তওবা করতেছি।

ঈমান ও মা'রিফাত থেকে যে আলো উৎপত্তি হয়ে থাকে তাই তওবার মূল শিকড়। ঈমানের আলো যখন ক্রিয়া করে তখন মানুষ বুঝতে পারে তওবা করা ওয়াজিব। এর কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত: মানুষ কাফির হলে এ কুফররূপ মহাপাপ থেকে তওবা করে ঈমান আনয়ন করা তার উপর ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত: যদি কাফির না হয়ে মুসলমান হয় তবে মাতা-পিতার দেখাদেখি তাদের অনুসরণ করে মুসলমান হয়ে থাকলে তদ্রূপ অন্তঃসারশূণ্য হালকা ঈমান থেকে তওবা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তাদের কর্তব্য তদ্রূপ দেখাদেখি ঈমান থেকে তওবা করত: ঈমানের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে তৎপ্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের সাথে ধর্ম-ধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। তৃতীয়ত: আর একটি কথা কালেমার মর্মার্থ বুঝে নিয়ে অভ্যাসগত ও দেখাদেখি ঈমান থেকে তওবা করে নিলেও সর্বদা পাপ শূণ্য থাকা যায় না। তদবস্থায় পাপ কাজ থেকে তওবা করে শুধু নেক কাজের দিকে মনকে ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। চতুর্থত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারলে ও তার হৃদয়কে উক্ত পাপ সমূহের বীজ থেকে মুক্ত হতে পারবে না, সে পাপসমূহের চিন্তা ও কল্পনা অন্তরে থেকেই যাবে, তখন সর্ববিধ পাপ চিন্তা থেকেও তওবা করে অন্তরকে সৎচিন্তায় নিমগ্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে। পঞ্চমত: আবার পাপ চিন্তা থেকে মনকে বাঁচাতে পারলেও ভোজন স্পৃহা, কথন, প্রবৃত্তি, ধন লিপ্সা, অহংকার, সাধুতা প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি যে যে প্রবৃত্তিগুলো পাপ কাজের ও পাপ চিন্তার মূল, তৎসমুদয় থেকে তওবা করে আত্মাকে পবিত্র করা ওয়াজিব। প্রবৃত্তি গুলো দমন পূর্বক প্রত্যেকটিকে সাধ্যের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বুদ্ধি ও শরীয়তের অধীন করে নেওয়া ওয়াজিব। ষষ্ঠত: প্রবৃত্তিকে আজ্ঞাধীন করার জন্য উপরিউক্ত কাজ গুলো করা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনার বিষয়। এ দুঃসাধ্য কঠিন কাজ গুলো আয়ত্ব করতে পারলেও সম্মুখে আবার শয়তানের কুমন্ত্রণা, অন্তরের বোঁকা এবং নানাবিধ অমূলক সন্দেহ ও কল্পনা এসে মনের মধ্যে উদিত হয়ে এ সমস্ত বাধা বিপত্তির প্রতি পদে পদে মহা বিপদ ডেকে আনতে পারে। অতএব অমূলক সন্দেহ, অন্তরের ধোঁকা এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে তওবা করা আবশ্যক। সপ্তমত: এ বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা পেলেও আর একটি কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ কখনো কখনো মন আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এরূপ অমনোযোগিতা থেকে প্রায় কোন মানুষের মনই মুক্ত নয়। অতএব উক্তরূপ অমনোযোগিতা থেকেও তওবা করা আবশ্যক। অষ্টমত: মানুষ সাময়িক সময়ের জন্যও আল্লাহকে ভুলে থাকে না, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ও ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে। এমন অবস্থায় উন্নীত হতে পারলেও আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তার সম্মুখে এক অতি প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাধনা পথের পথিক যে পথের কোন এক ধাপে উন্নীত হয়ে তথাকার মঙ্গল ও কল্যাণে সন্তুষ্ট হয়ে সাধনা ও চেষ্টায় বিরত থাকলে অর্থাৎ আরও অধিক উন্নতি লাভের জন্য পরবর্তী অধিক কল্যাণময় উচ্চতম ধাপের দিকে অগ্রসর না হলে তাকে এক অনির্বচনীয় মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এটা আত্মার পক্ষে একটি বিরাট ক্ষতি। সুতরাং সাধনার বিরতি ও চেষ্টা বিমুখতা থেকে তওবা করে অক্লান্ত সাধনা সহকারে ক্রমোন্নতির পথে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে যাওয়া আবশ্যক। তাই প্রাচীন কালের বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, "সাধারণ মুত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে যে কাজ পূণ্যজনক, আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত মহাপুরুষের পক্ষে তা ক্ষতিজনক বলে বিবেচিত হয়।" হযরত হাসান (রা.) বলেন, তওবার চারটি ধারা। যথা: ১. মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ২. আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া, ৩. পাপ কাজ হতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফিরিয়ে রাখা এবং ৪. এইরূপ পাপ ভবিষ্যতে না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাপ করে যদি কেউ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অথচ সে সেই পাপের উপরই স্থির থাকে, তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে ঠাট্টা ও তামাশা করল। তাই খালেছ তওবা করা আবশ্যক। আর খালেছ তওবা কখনও বিফলে যায় না। হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার চার হাজার বছর পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ আরশের চারপাশে লিখিত ছিল "আইন্নি লাগাফ্ফারু লিমান তাবা অ আমানা অ আমিলা ছালিহান ছুম্মাহতাদা"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করে ঈমান আনে সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে থাকি। কেননা সে হেদায়ত প্রাপ্ত। অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করার জন্য একমাত্র উপায় হলো তওবা। ময়লা পোশাক সাবান দ্বারা ধৌত করলে যেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, তদ্রুপ তওবা করার পর মনোযোগের সাথে ইবাদত করতে থাকলে সে ইবাদতের আলোকে পাপ তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হঠাৎ তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে সাথে সাথেই কোন নেক কাজ কর, তাতে এ নেক কাজই পূর্ববর্তী পাপ কাজটিকে মুছে ফেলবে।" তিনি আরও ইরশাদ করেন, "তুমি যদি এত অধিক পরিমাণে পাপ কাজ কর যে, তা স্তুপীকৃত হয়ে আসমানের সমান উচ্চ হয়ে যায়। অতঃপর অনুতাপের সাথে তওবা কর। তথাপি তোমার তওবা কবুল হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে না।" চারটি বস্তু দ্বারা তওবার পরিচয় মিলে। যথা - ১. অযথা কথাবার্তা, পরনিন্দা, এবং অশ্লীল গালাগালি হতে রসনা সংযত রাখা, ২. কারও প্রতি শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা, ৩. কু লোকের সংগ হতে দূরে থাকা, ৪. সদা সর্বদা মৃত্যু-চিন্তা করা ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। একদা জনৈক ব্যক্তি এক তত্ত্বজ্ঞানী আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করেছিল– যদি কোন তওবাকারী অবগত হতে চায় তার তওবা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা, তবে অবগত হওয়ার কোন উপায় আছে কি? তিনি বলেছিলেন এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা যায় না, তবুও তওবা কবুল হওয়ার কিছু লক্ষণ আছে। যেমন- তওবা অনুশোচনার পর বান্দা সর্বদা পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে। অনর্থক আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকবে। মনকে আধ্যাত্মিক রোগ থেকে পবিত্র রাখবে, নিজেকে সর্বদা আল্লাহর সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে। সৎ লোকের সংসর্গ অবলম্বন করবে, অসৎ লোকের সংসর্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। পার্থিব স্বল্প পরিমাণ সম্পদকেই সে যথেষ্ট মনে করবে, কিন্তু পরকালের জন্য কৃত আমল ও ইবাদতকে সামান্য ভাববে। অন্তরকে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত আনুগত্যে নিবেদিত রাখবে, জিহ্বা সংরক্ষিত রাখবে। নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ধ্যান মগ্ন থাকবে। অতীত জীবনের কৃত পাপ কাজের কথা মনে করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করবে। তওবা অনুতাপের পর কেউ নিজের মধ্যে এসব আলামত লক্ষ্য করলে সে বুঝে নিতে পারে আল্লাহর দরবারে তার তওবা কবুল হয়েছে।' কথিত আছে এক লোক পাপ করার সাথে সাথে তা একটি খাতায় লিখে রাখত। (যাতে পুনরায় আর সে পাপে লিপ্ত না হয়।)। একদিন সে কোন একটি পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা লিপিবদ্ধ করার জন্য খাতাখুলে দেখতে পেল পূর্বের লেখা সব পাপ কর্ম সম্পূর্ণ মুছে গেছে এবং তদস্থলে নিম্নের আয়াত লেখা রয়েছে, "ফা উলাইকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লাহু সায়্যিআতিহিম হাসানা"। অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তাদের গুনাহ পরিবর্তিত করে পূণ্যে পরিণত করে দেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত ৭০) অর্থাৎ তওবাকারী আন্তরিক তওবা অনুতাপের বরকত ও কল্যাণে সে যে শিরক করেছিল, তদস্থলে ঈমান, ব্যভিচারের স্থলে ক্ষমা, অবাধ্যতা ও নাফরমানীর স্থলে আনুগত্য ও পাপ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের সওগাত এসে গেছে। রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোন কোন বান্দা এমন আছে যে, পাপ কাজের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে" তা শুনে সাহাবাগণ সবিনয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ এ কেমন করে সম্ভব হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার পর তদ্দরুন বিশেষ অনুতপ্ত হয়ে পড়বে। বেহেশতে পৌঁছা পর্যন্ত সেই অনুতাপ ও লজ্জা তার দৃষ্টি পথের সম্মুখে উপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ পাপানুষ্ঠান করার পর তার হৃদয়ে এমন তীব্র অনুতাপ ও অনুশোচনা উপস্থিত হবে যে, সে অনুতাপের ভীষণ যাতনা জীবনে আর কোন সময় কোন পাপের কল্পনা তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিবে না। এ অনুতাপই মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত তার অন্তরে বিদ্যমান থেকে তাকে বেহেশতে পৌঁছাবে। খালেছ তওবাকারীকে আল্লাহ পাক চারটি জিনিস দান করে থাকেন। যথা ১. আল্লাহর তা'আলা তার পাপকে এমনভাবে ক্ষমা করেন, যেন সে পূর্বে কোন পাপই করে নি। ২. আল্লাহ তা'আলা বন্ধু বলে সম্বোধন করেন। ৩. শয়তান তার নিকট আসতে পারে না। ৪. পরকালের ভয় হতে আল্লাহ তাকে নির্ভয়, নিরাপত্তা ও শান্তি দেন। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসিলায় আমাদের খালেছ তওবার তওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. কিমিয়ায়ে সা'আদাত।
২. গুনিয়াতুত্ তালেবীন।
৩. মিনহাজুল আবেদীন।
৪. ফতহুল গায়ব।
৫. মুকাশাফাতুল কুলুব।

আউলিয়ায়ে কিরাম ও বেলায়ত

• সৈয়দ আবু আহমদ •

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রূহ এবং শরীর এই দুই উপাদানের সমষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করে তার স্বভাবে জন্মগতভাবে শরীর ও আত্মার প্রয়োজনীয়তা ও প্রেরণা গেঁথে দিয়েছেন। তাই শরীর যেমন তার অস্তিত্ব ও সুস্থতা রক্ষার জন্য চায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তেমনি আত্মাও চায় তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উভয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে মানবজাতির জন্য। আল্লাহ তায়ালা যার সম্পূর্ণ নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন নবী -রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে। এমনকি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে কুরআন মজীদ ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট পথরেখা নির্ধারণ করে দিলে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়তের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু প্রিয় বান্দা আছেন যাঁরা আল্লাহর নির্দেশিত এবং প্রিয় নবী (দ.) এর প্রদর্শিত পথ ও মতের একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাঁরা আল্লাহর কুদরতের মাধ্যমে পরিণত হয়েছেন। আল্লাহর বাতেনি রাজ্যের নানা দায়িত্বে তাঁরা নিয়োজিত। তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর অলি বা, আউলিয়া-ই-কিরাম হিসেবে চিনি ও জানি। কিন্তু তাঁদের হাল অবস্থা মানুষের উপলব্ধির বাইরে। তাঁদের জানা-বুঝা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, তাঁরা আল্লাহর কুদরতি চাদরে ঢাকা। তেমনি তাঁদের বেলায়তও এক রহস্যাবৃত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা জানানো ব্যতিত তাঁদেরকে জানা অসম্ভব। ফলে তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বেলায়ত (বন্ধুত্বের তাজ) দ্বারা অলংকৃত করেছেন। তাঁরা মারিফতকে জেনেছেন। তাঁদের স্বরূপ উন্মোচন বা জানা একমাত্র আলেমেদ্বীনদের সংস্পর্শে আসলেই সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নে কুরআন ও হাদীস এর আলোকে আউলিয়ায়ে কিরাম ও বেলায়ত সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ আমরা আরো জানব।

ওলীর সংজ্ঞা: আল্লামা সাদ উদ্দিন মাসউদ বিন ওমর তাফতাযানী (রহ.) বলেন– 'অলি' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত। এরূপে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন এবং সকল প্রকার লালসা ও মনের কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকেন। (শরহুল আকাইদ, কারামাতুল আউলিয়া হক্কুন, পৃষ্ঠা-১৪৪)

ফখরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী (রহ.) অলির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন– "ওলী হচ্ছেন, যিনি বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করেন এবং শরীয়ত মোতাবেক সৎকর্ম পালন করেন। তিনি আরো বলেন– যখন বান্দা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ করেন এবং তাঁর (আল্লাহ) মারিফাতের মধ্যে ডুবে যান, তখন তাঁর অন্তরে একমাত্র আল্লাহর সত্তা বৈ কোন কিছুর দিকে মনোযোগ থাকেনা ওই অবস্থায় তাঁর পরিপূর্ণ বেলায়ত অর্জন হয়। যখন তাঁর এই মর্যাদা অর্জন হয়, তখন তাঁর কাছে কোন কিছুর ভয়-ভীতি অনুভব হয়না। এবং কোন কারণে দুঃখ ভারক্রান্ত হন না।" (তাফসীরে কবীর, সূরা ইউনুছ- ৬২, ৬/২৭৬)।

ওলীগণের প্রকারভেদ: আল্লাহর ওলীগণ সর্বকালে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আল্লাহর ওলীগণের বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। নিম্নে তদবিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

১. আক্বতাব: শব্দটি 'কুতুবুন' শব্দের বহুবচন। কুতুব আল্লাহ তায়ালার এমন মর্যাদাবান ওলী, যিনি প্রতি যুগে এবং একই সময়ে একজন হয়ে থাকে। তাঁদের 'গাউস'ও বলা হয়। 'কুতুব' আল্লাহ তায়ালা'র অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তিনি স্বীয় যুগবলয়ের সকল ওলীর অভিভাবক হয়ে থাকেন।

২. আয়িম্মা: তাঁরা প্রতিযুগে দুইজনই হয়ে থাকেন। তাঁরা দুইজনই কুতুবের ওযীর হয়ে থাকেন। 'কুতুব' এর ইনতিকালের পর তাঁরা দুইজনই তথায় প্রতিনিধি হন। তাঁদের একজন 'আলমে মালাকুত' এবং অন্যজন 'আলমে মুলক' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেন।

৩. আওতাদ: তাঁরা চারজন হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এ চার জনের মাধ্যমে চারদিক তথা পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ এর সংরক্ষণ করেন।

৪. আবদাল: এ প্রকার ওলী প্রতিযুগে সাতজন হয়ে থাকেন। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ সাত জমীনকে সংরক্ষণ করেন। এ সাতজন ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত সাত নবীর কদমের উপর বিদ্যমান থাকেন। তাঁরা হলেন, হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, হযরত মুসা কলিমুল্লাহ, হযরত হারুন (আ.), হযরত আদম সফীউল্লাহ, হযরত ইদ্রীস (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আ.)।

৫. নুকবা: প্রতিযুগে এ ধরণের ওলী বারজন হয়ে থাকেন। প্রত্যেক নবীর আসমানের বারটি বুরুজের এক একটির বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ওই সকল নকীবকে আসমানী বিধানাবলীর জ্ঞান দ্বারা ধন্য করেন।

৬. নুজবা: এ প্রকার ওলী প্রতিযুগে আটজন হয়ে থাকেন। এ সংখ্যা থেকে কম বেশি হয় না। তাঁদের উপর সর্বদা 'হাল' বিরাজমান থাকে। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে মালিকের সম্বন্ধ মজবুত হয়ে গিয়ে তাঁর হৃদয়ে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তাকেই 'হাল' বলে)।

৭. রজবী: তাঁরা প্রত্যেক যুগে চল্লিশজন হয়ে থাকেন। তাঁরা এমন বান্দা যাঁদের 'হাল' আল্লাহর মহত্ত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তাঁরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

৮. আদম (আ.) কলবের অনুরূপ: এ প্রকার ওলী প্রতিযুগে ৩০০ জন হয়ে থাকেন। তাঁদের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন– 'তাঁরা আদম (আ.) এর কলবের উপর রয়েছেন'। তাঁদের প্রত্যেককে ৩০০টি খোদায়ী চরিত্র দান করা হয়।

৯. নূহ (আ.)'র কলবের অনুরূপ: এ প্রকার ওলী প্রতিযুগে চল্লিশজন হয়ে থাকেন। হুযুর পাক (দ.) ইরশাদ করেন– 'আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় চল্লিশ জন ব্যক্তি নূহ (আ.)'র কলবের অনুরূপ হবেন।

১০. ইব্রাহীম (আ.)'র কলবের অনুরূপ: এ ধরণের অলি প্রতিযুগে সাতজন হয়ে থাকেন। তাঁদের ব্যাপারেও পবিত্র হাদীসে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের মকাম সকল প্রকার সন্দেহ থেকে নিরাপত্তাময় মকাম।

১১. জিব্রাঈল (আ.)'র কলবের অনুরূপ: প্রতিযুগে এ প্রকারের ওলী পাঁচজন হয়ে থাকেন। তাঁরা বেলায়তের বাদশা হয়ে থাকেন। তাঁরা কিয়ামত দিবসে জিব্রাঈল (আ.) এর সাথে থাকবেন।

১২. মীকাঈল (আ.)'র কলবের অনুরূপ: এ প্রকার ওলী প্রতি যুগে তিনজন হয়ে থাকেন। এ পবিত্র আত্মাসমূহ কল্যাণ, রহমত এবং নম্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন।

১৩. ইস্রাফীল (আ.)'র কলবের অনুরূপ: প্রতিযুগে এ প্রকার ওলী একজনই হয়ে থাকেন। শরীয়তের আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত হয়। প্রিয় নবী (দ.) বলেন– এ প্রকারের ওলী হযরত ইস্রাফীল (আ.) থেকে ইলমের ভাগ লাভ করেন।

১৪. রিযালুল গায়েব: তাঁরা এগারজন ওলী হয়ে থাকেন, এর বেশী কম হয় না, তাঁরা হচ্ছেন– 'আহলে খুত'।

১৫. আল্লাহর শক্তি প্রকাশক ওলী: প্রতিযুগে এ প্রকারের ওলী শুধুমাত্র আটজন হয়ে থাকেন। কুরআন শরীফে তাঁদের নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, 'তাঁরা কাফেরদের উপর বড়ই কঠিন। আল্লাহর পথে তিরস্কার কারীদের কোন তিরস্কারকে তাঁরা গুরুত্ব দেয় না। তাঁদেরকে 'রিজালুল কহর' ও বলা হয়ে থাকে। (জামেউ কারামাতিল আউলিয়া, ১/৬৯-৭৪)

উল্লেখিত প্রকার ছাড়াও আউলিয়া কেরামের আরো অসংখ্য প্রকার রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ততার জন্য উল্লেখ করা হলনা।

বেলায়ত এর সংজ্ঞা: মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (রহ.) বলেছেন, 'বেলায়ত এক বিশেষ নৈকট্য। মহান আল্লাহ নিজ প্রিয় বান্দাদেরকে স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়ায় এ নৈকট্য দান করে থাকেন।' (বাহারে শরীয়ত ১/২৬৪)

ইমাম ফখরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী (রহ.) বেলায়তের সংজ্ঞায় বলেন, 'বেলায়ত এক খাস (বিশেষ) নৈকট্যের নাম। যিনি ওই বিশেষ নৈকট্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছেন তিনিই আল্লাহর ওলী'। (তাফসীরে কবির, সূরা ইউনুস, ৬২ আয়াত, ৬/২৭৬)।

ইমাম আহমদ রেযা খান ব্রেলভী (রহ.) বেলায়তের সংজ্ঞায় বলেছেন– 'বেলায়ত অর্জনের বিষয় নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত দান, হ্যাঁ! এ পথে প্রচেষ্টাকারীদেরকে উহার পথ দেখিয়ে থাকেন। এটা এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, "ওয়াল্লাজীনা জাহাদো ফিইনা লানাহ্‌দিয়ান্নহুম ছুবুলানা, ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআ'ল মুহছিনিন" অর্থাৎ- এবং যারা আমার পথে চেষ্টা করেছে অবশ্য আমি তাদেরকে আমার পথ সমূহ দেখিয়ে থাকি। (সূরা আনকাবুত ৬৯ আয়াত, ও ফতোয়ায়ে রজভীয়া ২১/৬০৬)

অনেক সময় তাকওয়ার কারণে কেউ কেউ ওলী হয়ে যায়। এ কারণে কতেক আলিম বেলায়তকে অর্জন যোগ্য বিষয় বলে মনে করে থাকেন। যেমন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) বলেছেন– 'আল্লাহর প্রিয়জনদেরকে 'আউলিয়া আল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। আর তাঁর অপ্রিয়দেরকে 'মিন দুনিল্লাহ' বলা হয়। ওই মকবুল বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ তো আল্লাহভীতি এবং পবিত্রতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন। একে 'বেলায়তে কাসবী' বলা হয়। কিছু জন্মগত অলি হয়ে থাকেন। এটাকে 'বেলায়তে আতায়ী' বলা হয়। দেখুন হযরত মরিয়ম (আ.) জন্মগত ওয়ালিয়া ছিলেন এবং আদম (আ.) কে সৃষ্টি হতেই ফেরেস্তাগণ সেজদা করেছেন। কিছু লোক কারো সুদৃষ্টির মাধ্যমে ওলী হয়ে যায়। এটাকে 'বেলায়তে

ওয়াহবী' বলা হয়। যেমন হযরত মুসা (আ.) এর যাদুকরগণ, তারা একই সময়ে মু'মিন সাহাবী এবং শহীদের মর্যদা লাভ করেন। অথবা হাবীবে নাজ্জার যিনি হযরত ঈসা (আ.)'র হাওয়ারীদের শুভ দৃষ্টিতেই ওলী হয়ে যান। এ আয়াতে উক্ত তিন প্রকারের অলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, সূরা ইউনুছ ৬২ নং আয়াত)

বেলায়তের প্রকারভেদ: বেলায়ত দুই প্রকার যথা- ১. বেলায়তে তাশরিঈ এবং ২. তাকভিনী।

১. বেলায়তে তাশরিঈ: ওলী শব্দটি 'ওয়ালায়ুন' থেকে নির্গত। অর্থ সাহায্য করা, তত্ত্বাবধান করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। এই শব্দ থেকে মাওলা শব্দও আসে। ওই সব অর্থানুসারে বেলায়ত হচ্ছে ব্যাপকার্থক। আর ওলী প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ কেউ হতে পারে। তবে প্রত্যেক নেককার মুসলমান, যিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তাঁকে 'ওলীয়ে তাশরিঈ' বলা হয়। ওলীকে ওলী এ কারণেও বলা হয়, তিনি বান্দার সাহায্যকারী এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী হয়ে থাকেন।

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) বলেন- 'ওলী দুই প্রকার- ১. 'ওলীয়ে তাশরিঈ' এবং ২. ওলীয়ে তাকভিনী। প্রত্যেক নেককার মুসলমান যিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন তিনি ওলীয়ে তাশরিঈ। (তাফসীরে নুরুল ইরফান)।

বেলায়তে তাকভিনী: কখনও 'ওয়ালায়ুন' শব্দের অর্থ নৈকট্য হয়ে থাকে। এ অর্থের ভিত্তিতে বেলায়তকে তাকভিনী বলা হয়। যিনি এটা অর্জন করেছেন তাঁকে ওলীয়ে তাকভিনী বলা হয়।

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) বলেন, ওলীয়ে তাকভিনী হচ্ছেন তিনি যাঁকে আল্লাহর রাজত্বে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। 'ওলীয়ে তাশরিঈ' প্রত্যেক চল্লিশজন মুত্তাকী মুসলমানদের মধ্যে একজন হয়ে থাকেন। কিন্তু 'ওলীয়ে তাকভিনী' হচ্ছেন বিশেষ সম্প্রদায় যাঁদের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ হচ্ছেন গাউস, কুতুব ও আবদাল ইত্যাদি। তাঁরা কিয়ামত দিবসের সকল ভয়ভীতি, দুঃখ কষ্ট থেকে আশঙ্কামুক্ত। (তাফসীরে নুরুল ইরফান)

বেলায়তের স্তর সমূহ: আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন- "ইন্না আউলিয়াউহু ইল্লাল মুত্তাকুন" অর্থাৎ: আল্লাহকে ভয়কারীগণই হচ্ছেন ওলী। (সূরা আনফাল-৩৪ আয়াত) মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-'তাকওয়ার চারটি স্তর আছে, একারণে বেলায়তেরও চারটি স্তর। তা হচ্ছে- ১. কুফর থেকে বাঁচা ২. পাপ থেকে বিরত থাকা ৩. সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং ৪. গাইরুল্লাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। গাইরুল্লাহ হচ্ছে যা মহান আল্লাহ থেকে বিমুখ করে। যদি নামায এবং অন্যান্য ইবাদত লোক দেখানো উদ্দেশ্যে হয় তবে তা গাইরুল্লাহ। আর যদি খানা পিনা আল্লাহর কারণে হয় তবে তা গাইরুল্লাহ নয়। কিন্তু কিছু লোক অনেক ভাংখোর এবং আফিম সেবীকে ওলী হিসেবে জানে। এটা সঠিক নয়। কিছু লোক বিধর্মী ও ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসী লোকদেরকে ওলী হিসেবে জানে, এটাও প্রতারণা। (তাফসীরে নুরুল ইরফান)।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে যে, 'তাঁর বন্ধুতো কেবল পরহেযগারগণই হতে পারে কিন্তু অধিকাংশই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না'। (সূরা আনফাল /৩৪ আয়াত)

সূরা আনফালের উক্ত আয়াতে আল্লাহর বন্ধু তথা যারা বেলায়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা মুত্তাকি হয়ে থাকেন। অর্থাৎ বেলায়ত ও তাকওয়া পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক ও অপরিহার্য অংশ। তাকওয়া ব্যতিত বেলায়তের কল্পনা নিছক ভ্রান্তি। যে বেলায়তের আসনে অধিষ্ঠিত হতে চায় তাঁকে তাকওয়ার লেবাস পরিধান করতেই হবে। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় বিশেষ লেবাসধারী লোকজন যারা নির্দ্বিধায় শরীয়ত বিরোধী কার্য কলাপে লিপ্ত হয় ওরা কখনো বেলায়তের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বে নামাযী শয়তানের বন্ধু হতে পারে আল্লাহর নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের পরিচয় তুলে ধরেছেন, শরীয়তের প্রতি যথাযথ যত্নবান, মুত্তাকী পরহেযগার হিসেবে। (তাসাউফের আসল রূপ, ড. তাহের আল কাদেরী)

ইদানিং অলিউল্লাহ ও বেলায়ত নামে ভন্ডামী ও প্রতারণা চলছে, যার ফলে প্রকৃত আউলিয়ায়ে কিরাম ও বেলায়তের বদনাম রটে যাচ্ছে। ফলে তরুণ প্রজন্ম ও আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী সূফী তরিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। তারা মনে করে থাকে এসব সর্বৈব ধোঁকা ও প্রতারণা। এ কারণে বিষয়টি সকলের জন্য স্পষ্ট করে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে, যাতে তাসাউফ এর স্বরূপ সবার সামনে উদ্ভাসিত হয় যে, শরীয়তে মুহাম্মদী (দ.) এবং রাসূলের (দ.) যেখানে সার্বিক অনুসরণ থাকবে না সেখানে তাসাউফ ও তরীকতের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই সত্য সন্ধানী মানুষ সত্যিকার তাসাউফের মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কিরাম ও বেলায়তের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হতে পারে সে চেষ্টাটাই রইল ছোট্ট পরিসরে।

ইসলামী সমাজে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা

• মাওলানা মোহাম্মদ নেজামউদ্দীন চিশ্‌তী •

প্রাথমিক কথা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী রাসূল আগমন করবেন না। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভাষায় তিনি পুরো জগতের নবী। জগত ব্যাপী দ্বীন প্রচার ও দ্বীনের সঠিক রূপরেখা বাস্তবায়ন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর এ দাওয়াতী কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেছেন উম্মতের হক্কানী-রব্বানী (শরীয়ত ও তরিকত এর জ্ঞান সম্পন্ন) ওলামায়ে কিরাম তথা আউলিয়ায়ে এজামদের ওপর। নবীগণ যেরূপ যুগে যুগে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেছেন সেরূপ উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরামও এ দায়িত্ব পালন করবেন। হাদীসে জিব্রাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করেন, এক. ইসলাম, দুই. ঈমান ও তিন. ইহসান। ইসলামের প্রথম যুগে এ তিনটি শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বিরাজমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামে আকলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কেবল ইসলামের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানগুলো আকল দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা হয়। আরেক দল শরয়ী বিধি বিধান প্রতিপালনে কেবল কুরআন হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করাকেই ইসলাম বলে দাবী করে। এ দু'দলের বাইরে আরেকদল দার্শনিক কুরআন হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করে নতুন এক দর্শনের সূচনা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এরা সূফী সাধক হিসেবে পরিচিত। পূর্বে বলা হয়েছে, ইসলাম, ঈমান ও ইহসান তিনটি যারা সমানভাবে প্রতিপালন করার চেষ্টা করেন তারাই প্রকৃত মুসলমান। ইহসান এর সংজ্ঞা দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন,

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ: এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। তা না হলে অন্তত তিনি তোমাকে দেখছেন সেই অনুভূতি নিয়ে ইবাদত কর। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা) এ স্তরে উপনীত হওয়াই তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে তাসাউফ এর পরিচয়, তাৎপর্য, ক্রম বিকাশ ও ইসলামী সমাজে তাসাউফ এর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তাসাউফ এর শাব্দিক পরিচয়: তাসাউফের মূল ধাতু এবং সূফী শব্দের নাম করণ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ আলেমদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আলেমগণ তাসাউফের মূল ধাতু কয়েক ধরনের দেখিয়েছেন। এর কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম মত: الصفا (আস্ সাফা) কারো মতে তাসাউফের মূল ধাতু আস্ সাফা। যার অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। এই মূল ধাতুর ভিত্তিতে যেকোন জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করার নামই তাসাউফ। শায়খ আবুল ফাতাহ বসতী তাসাউফের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ان التصوف كلمة اشتقت من الصفا

অর্থাৎ: তাসাউফ 'সফা' থেকে নির্গত একটি শব্দ, যার অর্থ, পরিচ্ছন্নতা।

'আল্ মুনজিদ প্রণেতা তাসাউফ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, صفى اى تصفية الشئى وجعله صافيا

অর্থাৎ: صفى থেকে উদ্দেশ্য কোনো জিনিসকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা। (المنجد تحت ماده صفا)

হযরত দাতা গঞ্জবখ্‌শ মাহদুম আলী হাজ্‌জ্‌বীরী (রহ.) নিজের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাশফুল মাহজুব' এ শাইখ খিযরীর ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন,

التصوف صفاء السر من كدورة المخالفة

অভ্যন্তরভাগকে সত্যের বিরোধিতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত-পবিত্র করার নাম তাসাউফ।

দ্বিতীয় মত: الصفو 'আস্‌সফ্‌ভু' তাসাউফের দ্বিতীয় মূলধাতু الصفو আস্‌সফ্‌ভু। যার অর্থ 'ভালবাসায় ও বন্ধুতায় একনিষ্ঠতা'। যেমন আল মুনজিদ প্রণেতা এই ধাতুর প্রসঙ্গে লিখেন,

الصفو هو الاخلاص فى المودة الصفى لو الصديق المخاص

অর্থাৎ: الصفو থেকে উদ্দেশ্য একনিষ্ঠ ভালবাসা। আর صفى অর্থ একান্ত খাঁটি বন্ধু। এই ধাতু হিসেবে সূফী থেকে উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি যে দুনিয়া-আখিরাতের প্রাপ্য প্রতিদানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মাহবুবে হাকিকী তথা আল্লাহর সঙ্গে নিখুঁত ভালবাসার রজ্জুকে মজবুত করে। এই ধরনের ব্যক্তিদের সমূহ পরিশ্রমের প্রেরণা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই হয়ে থাকে।

তৃতীয় মত: الصوف 'আস্ সূফ্' তাসাউফের মূল ধাতু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় মত হলো, তাসাউফ الصوف 'আস্ সূফ্' থেকে

নির্গত। যার অর্থ পশম। বাবে তাফাউল থেকে তাসাউফে তার অর্থ দাঁড়ায় সে পশমের পোশাক পরিধান করলো। ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী (রহ.) বলেন,

تصوف اذا لبس الصوف كما يقال تقمص اذا لبس القميص

অর্থাৎ: تصوف বলা যায় যখন কেউ পশমের পোষাক পরিধান করে। যেমন تقمص বলা হয় যখন কেউ জামা পড়ে। সাহাবায়ে কিরামদের স্বর্ণযুগে বিনয়, সাধনা এবং পরমানুগত্যের জন্যে কোন কোন সত্য পন্থী পশমের পোষাক পরিধান করতেন। সেই পশমী পোষাকের কারণেই তাদেরকে সূফী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। শাইখ আয়াযুদ্দীন বলেন,

چو درزمان سابق صاحبان صفات مذکورة صوف رمی پوشیدند لهذا مجازا اعمال وافعال ایشارا تصوف نامیدند

অর্থাৎ: যেহেতু সাহাবাদের স্বর্ণযুগে বিনয়, সাধনা এবং পরমানুগত্যের দরুন সত্যপন্থীরা পশমের পোষাক পরিধান করতেন, তাই তাঁদের কাজ কর্মকে 'তাসাউফের' নামে নামকরণ করা হয়েছে। (غياث اللغات পৃষ্ঠা ১১৩)। মুদ্দাকথা হল তাসাউফ শব্দটি আরবী। এর অভিধানিক অর্থ হলো, মরমীবাদ সূফীদর্শন, কাম-ক্রোধ রিপু নিচয়ের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা হতে পবিত্র হওয়া ও তার আধ্যাত্মিক ধর্মীয় জ্ঞান। (ফরহাঙ্গে জাদীদ) বাংলায় যাকে সূফীতত্ত্ব বলা হয়। হুজুরে গাউসে পাক শাহানশাহে বোগদাদ (রা.) তাসাউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ পাকের প্রতি সততা একনিষ্ঠতা ও আল্লাহর বান্দাদের সাথে উত্তম আদর্শ, চরিত্র উপস্থাপন করার নাম তাসাউফ। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন ৬০৬ পৃষ্ঠা)

তাসাউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হযরত মারুফ আল করখী (রা.) বলেছেন, "আল্লাহর জাতের (সত্তার) উপলব্ধিই তাসাউফ।" আল্লাহর সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকেই ফানা (বিনাশ) করা প্রয়োজন। এমনকি আপনাকে পর্যন্ত ফানা করতে হয়। হযরত যুননুন মিসরী (রা.) এর মতে আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছু পরিত্যাগ করাই তাসাউফ। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রা.) বলেন, জীবন ও মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতাই তাসাউফ। আপন অহংবোধকে যতক্ষণ জীবিত রাখা যাবে ততক্ষণ পরম জাত পাককে উপলব্ধি করা যাবেনা। হযরত ইমাম গাযযালী (রা.) তাসাউফের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অপর সব কিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে সতত আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই তাসাউফ। হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ (র.) বলেন, "খোদা যাঁকে তাঁর প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন তিনিই প্রকৃত সূফী"। এ ব্যাপারে হযরত আল্ কুশাইরী (রা.) বলেন "জীবনের যাহেরী ও বাতেনী বিশুদ্ধতাই তাসাউফ" এখানে জীবনের নৈতিকতা ও আভ্যন্তরীণ 'ইহসান' বা সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় হযরত আবু মুহাম্মদ আয যাবিনীর ভাষায়। তিনি বলেন, "সচ্চরিত্র গঠন ও সমস্ত অনিষ্টকর কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকাই তাফাউফ"। অন্যত্র হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (রা.) বলেছেন, "আরাম আয়েশ ত্যাগ করা, এবং আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করাই প্রকৃত তাসাউফ"। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো ইসলামী সমাজে বাস্তবায়ন হলে সমাজের সকল অশান্তি দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে একটি সমাজ, পরিবার শান্তির ছায়া লাভ করতে পারবে।

তাসাউফ এর উৎপত্তি: "রাসূল পাক (দ.) এর সময় তাসাউফ ছিল একটি বাস্তবতা যার কোন নাম ছিল না। আজকে তাসাউফ হলো একটি নাম, কিন্তু এর বাস্তবতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন।" পরম সত্তাকে জানার ও চেনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। মানুষ এই পরিচয় আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলে সেই আল্লাহর পথে, যার ধারণা দর্শনশাস্ত্রে নৈর্ব্যক্তিক আল্লাহ রূপে মানুষের অন্তরের অনন্ত পিপাসাকে নিবারণ করতে অসমর্থ। সেই জন্যই মানুষ তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম প্রিয়তমের সন্ধান লাভ করে তাঁর সাথে নিবিড় যোগসূত্রে মিলিত হয়েছে। পরম সত্তাকে জানার এ প্রচেষ্টাকে 'মরমীবাদ' বলে অভিহিত করা হয়। মরমীবাদ তাই মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসাকে মেটাতে প্রয়াস পায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক অভাবিত সম্পর্কের সন্ধান দেয়। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে এই মরমীবাদ 'তাসাউফ' নামে খ্যাত। "সূফী" শব্দটি উৎপত্তি সম্পর্কে মুসলিম ধর্ম বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তবে মুসলিম চিন্তাবিদরা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এই সূফী সাধনার ইতিহাস হযরত মুহাম্মদ (দ.) থেকেই শুরু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবদ্দশাতে মসজিদে নববীতে কতিপয় সাহাবী ধ্যানে তন্ময় থাকতেন, তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বা 'আহলুস সুফ্ফা' (বারান্দার সঙ্গী বা অধিবাসী) বলা হতো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পূত

চরিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শের অধিকারী ছিলেন তাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদের শানে বলেছেন, আমার সাহাবীগণ উজ্জ্বল নক্ষত্র এতদসত্ত্বেও আসহাবে সুফ্ফাদের অতিরিক্ত ও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত তাঁরা পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, দ্বিতীয়ত তাঁরা পবিত্র কুরআনুল করীমের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র আদর্শ স্থাপনকারী সাহাবী ছিলেন। তৃতীয়ত তাঁরা এক অনাড়ম্বর বিলাস বিহীন জীবন-যাপন করতেন, চতুর্থত তাঁরা ন্যূনতম প্রয়োজন ব্যতিরেকে কখনো বাইরে যেতেন না এবং অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করতেন না; পঞ্চমত, তাঁরা যিকির-ফিকির ও মোরাকাবা-মোশাহেদায় মগ্ন থাকতেন; ষষ্ঠত, তাঁরা তকদির, রূহ, নফস, প্রভৃতি জটিল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন, সপ্তমত, তাঁরা হযরতের সাথে এত ঘনিষ্টভাবে মিশতেন বা মিশবার সুযোগ পেতেন, যার ফলে অনেক অজানা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ক গুপ্ত রহস্য যা সবার কাছে প্রকাশ নিষিদ্ধ ও এতদ্বিষয়ক খাস তালিম, যা চার খলীফাসহ মাত্র কতিপয় সাহাবায়ে কিরামই লাভ করেছিলেন- তার অধিকারী হয়েছিলেন। আসহাবে সুফ্ফাদের মধ্যে প্রথম চার খলিফা, হযরত সালমান ফারসী (রা.) হযরত আবু জর গিফারী (রা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হযরত মিকদাদ (রা.) হযরত আম্মার (রা.) হযরত মায়াজ (রা.) প্রভৃতি সাহাবায়ে কিরামদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে এত বেশি ভালবাসছিলেন যে, নিজেদের জীবন, ধন, মান, সংসার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকল কিছু আল্লাহ ও রাসূলের নিমিত্তে উৎসর্গ করে 'ফানা ফির রসূল' হয়ে গিয়েছিলেন ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফ্ফাদের নাম তাই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এঁদের জীবনে কোন আড়ম্বর তো ছিলনা, বরং দারিদ্র্যই ছিল এঁদের জীবনের ভূষণ। এই 'আসহাবে সুফ্ফা' থেকেই 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি। আমরা সাধারণ মানুষ জড় জগতের অধিবাসী। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে আল্লাহর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে দিবারাতে পাঁচবার আল্লাহর ঘর মসজিদে গমন করি। পক্ষান্তরে সূফীরা আল্লাহর ঘরের সংলগ্ন বারান্দার বাসিন্দা তথা আল্লাহর সর্ব সময়ের সঙ্গী। সূফীরা সকল সময় আল্লাহর স্মরণে (জিকিরে) ব্যাপৃত থাকেন, উচ্চ স্তরের আরিফগণ সর্বত্র, সব সময় আল্লাহকে দর্শন করেন, তাঁরা আল্লাহর সম্মানের চাদরের আবরণে আবৃত, কাজেই 'আসহাবে সুফ্ফা' বা আহলুস্ সুফ্ফা' থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তিতে সূফী তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের প্রকাশ লাভ ঘটেছে। পরন্তু 'সূফ' শব্দের অর্থ পশম। যাঁরা পশমি কাপড় পরিধান করেন, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন, তাঁরাই 'সূফী' নামে অভিহিত। কেউ কেউ 'সাফ' বা সারি (পঙক্তি বা কাতার) থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারনা করেন। তাঁদের মতে সূফীরা প্রথম কাতারের মানুষ। কিন্তু এটা কল্পনা প্রসূত মাত্র। মোল্লা জামী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ 'সাফা' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি ধরে থাকেন।

'সাফা' অর্থ পরিস্কার বা পবিত্রতা। সূফীরা পূত চরিত্রের অধিকারী বলে এটা ধরা হয়। কিন্তু এটা সূফী জীবনের একটা দিকের নির্দেশক। একমাত্র 'আসহাবে সুফ্ফা' শব্দেই সূফীতত্ত্বের ও সূফী জীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সময়েই এরা জাগতিক কাজ-কর্ম সমাধা করত সূফী সাধনায় মগ্ন হতেন। তাছাড়া হযরতকেই সূফী সিলসিলার আদিগুরু হিসাবে ধরা হয়। জিকির, ধ্যান মগ্নতা, গুঢ়তত্ত্ব আলোচনা, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সূফী সাধনার প্রয়োগ এবং কথা বার্তায় সূফী ভাবের প্রকাশ হযরতের জীবনেও ঘটেছে।

তাঁর আসহাব (সঙ্গী) ও তাবেয়ীনদের (সঙ্গীদের সঙ্গী) মধ্যে এভাবে লক্ষ্যণীয়। কাজেই 'সূফী' শব্দের উদ্ভব আসহাবে সুফ্ফা থেকেই যে হয়েছে, এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা।

তাসাউফের তাৎপর্য: তাসাউফকে যদি الصفا 'আস্সাফা' থেকে নির্গত মানা হয় তাহলে তাসাউফ থেকে উদ্দেশ্য সেই জীবন-পদ্ধতি যাকে সুসজ্জিত করে মানুষের অন্তর দোষের আঁধারি এবং পাপের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় পরিপূর্ণভাবে। পাপাচারের মরিচীকা মুছে যায় অন্তরের আয়না থেকে। ভেতর থেকে গাফেলতি ও অবাধ্যতার আঁধারি কাটিয়ে হৃদয় যেন ঝকঝকে মসৃণ হয়। তখনই সেই অন্তর হয় ঐশী আলোর উদয়স্থল। অন্তরের আঁধারি এবং নোংরামি আলোচনা কুরআনে এসেছে এভাবে,

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

অর্থাৎ: কখনও না, বরং তারা যা মন্দ করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (সূরা আল মুতাফ্ফেফীন, পারা ১৪)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ প্রসঙ্গে

বলেন,

المؤمن اذا اذنب كانت نكته سواء فى قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منهاوان زادت حتى يعلوقلبه فذاك الران الذى ذكر الله فى كتابه كلابل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون

অর্থাৎ: যখন কোন মুমিন বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তাওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন সে কালো দাগটি মুছে গিয়ে অন্তর ঝকঝকে সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে আরো বেশি গুনাহ করতে থাকে তখন সে কালো দাগটি বাড়তে থাকে। এই কালো দাগের কথা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল করিমে উল্লেখ করেছেন এই বলে, 'কখনও না, বরং তারা যা করে তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' আল্লাহর কুরআন ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান বাণীর মর্মার্থ হল ধারাবাহিক গুনাহর কারণে মানুষের অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। গুনাহ থেকে যদি ফিরে না আসে এবং গুনাহর পর গুনাহ যদি করতেই থাকে, তাহলে অন্তরের কালো দাগটি বাড়তে বাড়তে পুরো অন্তরকেই ঘিরে নেয়। যার ফলে অন্তরটি অন্ধকারের ঘেরাটোপে পরিণত হয়। এহেন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের গুনাহের ওপর অনুতাপ অনুশোচনার অনুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অপমৃত্যু তার অন্তরকে ঝাপটে ধরে। অপর দিকে যে ব্যক্তি সৎ কাজে মগ্ন থাকে তার অন্তরে আলোর একটি নিশানা অংকিত হয়। সে যখন ধারাবাহিকভাবে ভালো কাজ করতে থাকে, সে আলো প্রসারিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তার অন্তর আলোর উৎসস্থলে পরিণত হয়। সে আলো শুধু তার শরীরের সাম্রাজ্যকে আলোকিত করে না, আলোকিত করে সেই সব ব্যক্তিদেরও যারা তার সান্নিধ্যে আসে একটি পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে। সেই সব ব্যক্তিরা তো অত্যন্ত ভাগ্যবান, যারা অনুভূতির ধনে ধনবান। অন্তরের কালো দাগ ও ভেতরের অন্ধকার সম্পর্কে যারা পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সে তো প্রতিটি মুহূর্তে তওবার আলো জালিয়ে অন্তরের আঁধারিকে আলোর কিরণ দিয়ে পরিবর্তন করতে থাকে। এই সব একমাত্র আল্লাহর করুণা ছাড়া সম্ভবই নয়। এই নিরিখে সূফী সেই ব্যক্তি যিনি নিজের অন্তরকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করতে পেরেছেন এবং মনকে অসৎ চরিত্রের অন্ধকার থেকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যার ফলে তাঁর অন্তরে গুনাহের ছায়া-চিহ্ন বলতেই কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। আত্মশুদ্ধির এই পথ ও পন্থাকে তাসাউফ নামকরণ করা যায়। আত্ম পরিচ্ছন্নতার এমন মাপকাঠি যখন হয়ে যায়, তখন মানুষ আমল ও অন্তরের অবস্থা থেকে স্বাদ পেয়ে যায়। এবং সুস্থ জীবন লাভ করতে পারে।

তাসাউফের সাথে শরীয়ত ও তরিকতের সম্পর্ক: আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

لكلّ جعلنا منكم شرعة وّمنهاجا

অর্থাৎ: আমি তোমাদের জন্য একটি জীবন বিধান শরীয়ত ও অন্যটি খাস পথ বা মিনহাজ দান করেছি। মিনহাজ শব্দটি ত্বরিকত। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৪৮) আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষের ধারনা শুধু শরীয়ত মানার নাম ইসলাম, বা মুসলমান তারা ত্বরিকত বা তাসাউফের ধার ধারেনা, এই ধরনের মুসলমান বর্তমানে ইসলামের জন্য বড় কলঙ্ক ও গজবে পরিণত হয়েছে তারা ইসলামকে তথাকথিত জঙ্গিবাদে পরিণত করেছে। মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন,

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم-

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন (কামেল) মুসলমান সে, যার যবান (মুখ) ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। অনুরূপভাবে (কামেল) মুমিন সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে। (তিরমিজি ও নাসায়ী)

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় হচ্ছে যাদেরকে রাসূল পাক (দ.) নিরাপদস্থল বলেছেন তাদের হাত থেকে আজকে আরেক মুসলমান নিরাপদ থাকতে পারছেনা তাই আমাদের বুঝতে হবে যাদের হাত, মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ নয় সে প্রকৃত মুসলমান নয়, অন্যথায় রাসূল পাক (দ.) এর হাদীস মিথ্যা প্রমাণিত হবে তাই রাসূল পাক (দ.) এর হাদীস শুদ্ধ এটা আমাদের ঈমান কিন্তু যারা মুসলমান নাম দিয়ে মুসলমানের লেবাছ পড়ে মানুষের জান মালের ক্ষতি করে তারা কখনো মুসলমান নয়। সত্যিকার (কামিল) মুসলমান হতে হলে আমাদেরকে শরীয়তের পাশাপাশি তাসাউফের শিক্ষা তাসাউফ বা ত্বরিকত পন্থী হতে হবে। ইমাম মালেক (রহ.) এর একটি বিখ্যাত বাণী আছে, "মান তাসাওয়াফ্ফা ওয়া লাম ইয়াতাফাক্কাহা ফাকাদ তাযানদাকা; ওয়ামান তাফাকাহা ওয়া লাম ইয়াতাসাওয়াফা ফাকাদ তাফাসাক;

ওয়া মান তাসাওয়াফ্ফা ওয়া তাফাকাহা ফাকাদ তাহকাক।" অর্থাৎ: যে, ব্যক্তি ফিকাহ ছাড়া তাসাউফ শিক্ষা করে, সে যিনদিক তথা গোমরাহ, পথভ্রষ্ট হয়; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ বাদ দিয়ে ফিকাহ শিক্ষা করে সে ফাসিক গুনাহগার হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তাসাউফ ও ফিকাহ দু'টোই শিক্ষা করে সে সত্য ও ইসলামের বাস্তবতাকে খুঁজে পায়।"

সুতরাং প্রকৃত মুসলমান হতে হলে আমাদেরকে শরীয়ত, ত্বরিকত তথা তাসাউফ এর অনুসরণ করতে হবে। আল্লামা সৈয়দ শাহ তুরাবুল হক কাদেরী বলেছেন, তাসাউফ এবং ত্বরিকত সম্পর্ক শরীয়তের সাথে শরীর ও রূহ এর মত অর্থাৎ শরীরের সাথে নফ্স বা রূহ এর সম্পর্ক যেমন শরীয়ত, ত্বরিকত ও তাসাউফের সম্পর্কও তেমন। জিসিম বা শরীর ছাড়া যেমন রূহ এর অবস্থান কামনা করা যায়না, রূহ ছাড়া যেমন শরীরের অস্তিত্ব থাকেনা তেমনিভাবে শরীয়ত, ত্বরিকত ও তাসাউফ ছাড়া পরিপূর্ণ ইনসানে কামিল হওয়া যায় না।

তিনি ত্বরিকত ও তাসাউফকে এক বিষয় হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন, (তাসাউফ ওয়াত্ ত্বরিকত, পৃষ্ঠা ৬) এ ব্যাপারে হযরত আল্ কুশাইরী (র.) বলেন, 'জীবনের যাহেরী ও বাতেনী বিশুদ্ধতাই তাসাউফ" যাহেরী পরিশুদ্ধতার জন্য শরীয়তকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং বাতেনী পরিশুদ্ধতার জন্য তাসাউফ তথা ত্বরিকত এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। যারা উভয়ের মাধ্যমে জীবন গঠন করে তারাই মুসলমান তাদের মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ সুন্দর ও পরিশুদ্ধতায় পরিণত হতে পারে, তাই কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

বিনা তরিকতে শরীয়তের কোন মূল্য নাই,
সত্য গুরু চিনে ধর আল্লাহর আউলিয়া চাই।
রূমী বলে অপ্রেমিকের নাইরে কোন ঈমান ধন,
প্রেমেরী সন্ধানে চল মন।

এখানে প্রেম যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটাই তাসাউফ এবং এটাই শরীয়ত ত্বরিকত তথা ইসলামের মূল। সে জন্য হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ্ (রা.) বলেন, "খোদা যাঁকে তাঁর প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন তিনিই প্রকৃত 'সূফী"।

তাসাউফ মানে পরিপূর্ণ আদব: হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রা.) বলেছেন التصوف كله ادب অর্থাৎ: তাসাউফ সম্পূর্ণই আদব। আদব এটা এমন একটা নেয়ামত যার মাধ্যমে মানুষ অল্প সময়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীগণ অল্প সময়ে আল্লাহকে পাওয়ার কারণটা হল প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকত পন্থীদের মধ্যে পরিপূর্ণ আদব ছিল। গাউসে পাক (রা.) আদবের কারণে ছাত্র অবস্থায় অলিকুল সম্রাট হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আলী তামিমী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আমি যুবক বয়সে বাগদাদে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করি। মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ায় আমার এক ঘনিষ্ট সহপাঠি ছিলেন। তার নাম ইবনে ছাক্কা। আমরা উভয়ে ইবাদত বন্দেগীর পাশা-পাশি বুজুর্গ অলিগণের দরবারে যাতায়াত করতাম। ঐ সময়ে বাগদাদ নগরীতে একজন অলীকে লোকেরা গাউস বলত। ঐ গাউসের একটি মশহুর কারামত এই ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছা করতেন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আবার ইচ্ছা করলে হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে যেতেন। একটি আমি (আব্দুল্লাহ তামিমী), ইবনে ছাক্কা এবং যুবক আব্দুল কাদের জিলানী এই তিনজন উক্ত গাউসের সাথে দেখা করতে গেলাম। পথিমধ্যে ইবনে ছাক্কা বলল; আমি এই গাউস সাহেবকে এমন একটি প্রশ্ন করব যার জওয়াব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি (আব্দুল্লাহ) বললাম, আমিও একটা প্রশ্ন করব। দেখি তিনি কি জওয়াব দেন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী বললেন, নাউজুবিল্লাহ! আমি তাঁকে কী প্রশ্ন করব? আমি শুধু তাঁর দিদারের বরকত লাভের প্রতীক্ষা করতে থাকব। ইমাম আব্দুল্লাহ বললেন আমরা তিনজন উক্ত গাউস সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি আপন আসনে নেই, আসন খালি। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম তিনি উক্ত আসনে উপবিষ্ট। তিনি ইবনে ছাক্কার দিকে কড়া দৃষ্টিতে নজর করে বললেন, 'হে ইবনে ছাক্কা! তোমার বিনাশ হোক। তুমি আমাকে অমুক প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে চাও। যার জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নাও, তোমার প্রশ্ন এই এবং উত্তর এই। আমি তোমার মধ্যে কুফরীর অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত হতে দেখতে পাচ্ছি।" তারপর আমার দিকে নজর করে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি মনে মনে খেয়াল করেছ– তুমি আমাকে একটি প্রশ্ন করবে আর আমি কী উত্তর দিই– তা তুমি দেখবে। নাও! তোমার প্রশ্ন এই এবং উত্তর এই। দুনিয়া তোমার উপর এমন ধূলা নিক্ষেপ করবে যে, তুমি তাতে আকর্ণ ডুবে যাবে, এটা তোমার বেয়াদবির প্রতিদান। তার পর ঐ গাউস সাহেব হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর দিকে নজর করলেন এবং কাছে নিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, "হে আব্দুল কাদের! আপনি উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলকে সন্তুষ্ট করে ফেলেছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আপনি বাগদাদের মঞ্চে ওয়াজের কুরসিতে

উপবিষ্ট হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন– আমার এই কদম সমস্ত আউলিয়াদের কাঁধে। আপনার ঘোষণার সাথে সাথে যুগের সমস্ত আউলিয়া নিজ নিজ গ্রীবাদেশ নতকরে দিয়েছেন।" (মোল্লা আলী ক্বারী, নুজহাতুল খাতির) উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আদবের মাধ্যমে তিনি সম্মানিত হয়েছেন এবং সুসংবাদ লাভ করেছেন, আমরা যারা কাদেরী বা তাঁর ত্বরিকার অনুসারী আমাদেরকেও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। হক্কানী রব্বানী ওলামায়ে কিরামদের সামনে জবান বন্ধ রাখতে হবে এবং আউলিয়ায়ে কিরাম ও পীর মুর্শিদের দরবারে বসলে জবানের পাশাপাশি ক্বলবকে কু-ধারণা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এটাই তাসাউফের শিক্ষা। তাই একজন কামিল অলী বলেছেন,

من لاادب له لاايمان له ولاتوحيد له من لاادب له لاشريعة له

অর্থাৎ যার আদব নাই তার ঈমান নাই ও তৌহিদ নাই এবং যার আদব নাই তার শরীয়ত নাই। আল্লামা শেখ সাদী বলেছিলেন,

چون شمع ار پے علم پا یہ گداخت' کہ بے علم نتاوان خدارا شناخت

অর্থাৎ: মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যেমন উহা বিগলিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার বিদ্যা অর্জনের চেষ্টায় বিগলিত হওয়া কর্তব্য।

আল্লামা রুমী বলেছেন,

از ادب پر نور گشته ایں فلک ' از ادب معصوم پاک امد ملک

অর্থাৎ: এই আসমান আদবের দরুনই জ্যোতির্ময় হইয়াছে, আর আদবের দরুনই ফিরিস্তারা পবিত্র এবং মাসুম।

ইসলামী সমাজে তাসাউফ এর প্রয়োজনীয়তা: আজকে ব্যক্তিগত জীবন বলুন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোথাও শান্তি নাই, কারণ কী? যদি আমরা গভীর ধ্যান ও জ্ঞান দিয়ে নজর করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যতক্ষণ একজন মানুষ নিজে পরিশুদ্ধ হবে না সে কখনো পরিশুদ্ধ সমাজ বা রাষ্ট্র, পরিবারে পরিশুদ্ধতা আনতে পারেনা। তাই আমাদেরকে সর্বপ্রথম পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে হবে। এই পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে তাসাউফ পন্থী মুর্শিদ এর সন্ধান করে তাঁর রূহানী ফয়েজের মাধ্যমে 'নফ্সে আম্মারা' কু প্রবৃত্তি মূলক রিপুকে 'নফ্সে মুত্মায়িন্নাহ' প্রশান্ত আত্মা হাছিল করতে হবে। তাই রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ করেছেন।

قد افلح من زكها وقد خاب من دسّها

অর্থাৎ: যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (সূরা আশ্ শাম্স, ৯-১০ নং আয়াত, পারা ৩০)

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قد افلح من زكها وذكر اسم ربّه فصلّى

অর্থাৎ: নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালন কর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (সূরা আ'লা, আয়াত ১৪-১৫)। উক্ত আয়াত গুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আত্মশুদ্ধির মকাম আল্লাহর যিক্র এবং নামাযের চেয়েও উর্ধ্বে।

সুতরাং রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর যিকির ও নামাযের পূর্বে আমাদেরকে আত্মশুদ্ধিই অর্জন করতে হবে। এই আত্মশুদ্ধির নামই হল তাসাউফ। যিনি তাসাউফ পন্থী বা তাসাউফের মাধ্যমে জীবন গঠন করবেন তিনি একটি সমাজকে সুন্দর করতে পারবেন। নিঃস্বার্থ সমাজ গঠন করতে পারবেন। সূফী দর্শনের অন্যতম অনুসারী হযরত সুলতান বায়জিদ বোস্তামী (রা.)। তিনি বোস্তাম শহরের বাদশা ছিলেন, কিন্তু তাসাউফের সঠিক মর্ম অনুধাবনের পর তিনি বাদশাহীকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ধ্যানে আল্লাহ তালাশে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আর এই ক্ষমতার জন্য আমরা মানুষ হত্যা করি, মানুষের জান মালের ক্ষতি করি। তাসাউফের শিক্ষা হল

ومن يتوكل على الله فهو حسبه

অর্থাৎ: যিনি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হয় তার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। আল্লাহ যার হয়ে যাবে সমস্ত ক্ষমতা তাঁর অধীন হয়ে যাবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে আজ পর্যন্ত শান্তির বাণী যারা আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়াছেন তাঁরাই সূফী, যাঁদের ছিল আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস, যাঁদের ছিল মানুষের প্রতি দয়া, যাঁরা নিজে উপবাস থেকে সমাজকে খাবারের ব্যাবস্থা করতেন, নিজেরা জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, সম্পদের যথাযথ বন্টনের মাধ্যমে প্রতিবেশিদের, পরিবারের হক আদায় করতেন তারাই একটি সমাজকে সুন্দর ও শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারেন। তারাই তাসাউফপন্থী। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই রাব্বুল আলামীন যেন আমাদেরকে তাসাউফের সঠিক অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সুখী ও শান্তির জিন্দেগী হাছিল করতে পারি। আমিন বেহুরমতি সৈয়্যদুল মুরছালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

"আত্মশুদ্ধি ও আত্মার শুচিতা লাভ করতে হলে কামেল অলি আল্লাহ্ এর শরণাপন্ন হতে হবে"

• সৈয়দ নুর আহমেদ বাবর •

অলি-আল্লাহগণ জাগ্রত অবস্থায়ও নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় দুনিয়া থেকে মুক্ত থাকেন তাঁরা যেন "আসহাবে কাহফ"। অলি-আল্লাহগণ আল্লাহতে এরূপ মগ্ন থাকেন। যে, দুনিয়াতে অবস্থান করেও তাঁরা দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিজেদের মুক্ত রাখেন। দুনিয়াদার লোক সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। মাওলানা রুমি (রঃ) নিদ্রাবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, নিদ্রিত ব্যক্তি দুনিয়া থেকেও দুনিয়ার সব কিছু থেকে মুক্ত; তদ্রূপ অলিগণ জাগ্রত অবস্থায়ও আল্লাহতে মগ্ন থাকায় দুনিয়ার সব কিছু থেকে মুক্ত থাকেন। অলিগণ দিন-রাত সব সময়েই দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় বিচ্ছিন্ন থাকেন, ওইসবের প্রতি তাঁরা মোটেই লক্ষ্য রাখেন না, তাঁদের নড়াচড়া চলাফেরা সবকিছু পরওয়ারদেগারের ইচ্ছাতে পরিচালিত হয়। অলি-আল্লাহগণ যে আল্লাহতে নিমগ্ন থেকে দুনিয়া থেকে মুক্ত থাকেন এর সামান্য নমুনা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করেছেন, সাধারণ মানুষকে নিদ্রিতাবস্থায় সব লিপ্ততা, ব্যস্ততা এবং ধ্যান খেয়াল থেকে মুক্ত করে দেন। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের আত্মা বিশাল উন্মুক্ত জগতে (আলমে মেসাল বা আলমে বরযখ) চলে যায়, দেহ ও আত্মার এ বিচ্ছিন্নতায় কোনটিরই কষ্ট হয় না, উভয়ই আরামে থাকে। নিদ্রাবস্থায় মানবাত্মা যেরূপ দুনিয়ার সমুদয় ব্যস্ততা থেকে দুরে থাকে, অলিগণ আল্লাহর ধ্যানমগ্নতার মধ্যে দিয়ে সর্বদা অন্তরকে দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখেন। এটাই তাঁদের বড় পরিচয়।

অলি-আল্লাহগণ দুই শ্রেণীর, একশ্রেণীকে "কুতবুল এরশাদ" বলা হয়। তাঁরা সংযম সাধনার শিক্ষাদান ও অনুশীলন করানো দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরীন দোষ-আত্মিক রোগ দুর করে থাকেন। এদের কেরামতই বড়, এদের দ্বারাই মানুষের স্থায়ী মঙ্গল ও কল্যাণ হয়। আরেক শ্রেণীকে "কুতুবে তাকবীন" বলা হয়। এরা শিক্ষাদান বা অনুশীলন করানোর কাজ করেন না। শুধু নিজের আত্মার ক্ষমতার চাপ প্রয়োগে মানুষের অবস্থায় পরিবর্তন আনেন। যে রূপ ঘুমের চাপে মানুষের মধ্যে অনেক রকম পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

মানুষের দ্বীন ঈমানের উন্নতি এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল সম্পর্কীয় শিক্ষা সাধনা মুলতঃ প্রথম শ্রেণীর অলিদের দ্বারাই হয়ে থাকে। মানুষের দ্বীনী ঈমানী পরিবর্তন উন্নতি সাধনই তাঁদের কাজ। এ পরিবর্তন ও উন্নতি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। নবী রাসুলদের আগমন এবং আসমানি কিতাব নাযিল করার এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতায় প্রথম শ্রেণীর অলিদের দ্বারা জারি রাখা হয়েছে বলেই নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে নবীদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী বলেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অলিদের আসল দায়িত্ব সমাজের দ্বীন ঈমানের উন্নতি এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন নয়। আল্লাহর মকবুল বান্দা হিসাবে আত্মিক ক্ষমতার চাপে ক্ষেত্র বিশেষে এ কাজ হয়ে থাকে কিন্তু তাঁদের আসল দায়িত্ব পার্থিব জগতের বিভিন্ন পরিবর্তন ও উলট-পালটে আল্লাহ-তায়ালার ফরমান বাস্তবায়িত করা। এ কাজ মুলতঃ ফেরেশতাদের; ফেরেশতাগণ আসমানি জগতের অধিবাসি তাই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নজগতে তাঁদের সহযোগিরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর অলিদেরকে রেখে থাকেন।

দিবা-রাতের পরিবর্তনের ন্যায় মানুষের জাগ্রত ও নিদ্রা অবস্থায় যে অসংখ্য জাগতিক পরিবর্তন ঘটে, ওইসব পরিবর্তন এ দ্বিতীয় শ্রেণীর অলিদের দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই মাওলানা রুমি (রঃ) অলি-আল্লাহদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেনঃ-

ওইসব নুরানি ব্যাক্তিগণ মানুষের অন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ ভাল-মন্দের খেয়াল বের করে থাকেন (যে রূপ রাতে ঘুমের ঘোরে হয়ে থাকে)।

দিন হলে আবার তা দ্বারা অন্তর সমুহ ভরপুর করে থাকেন, মানুষের অন্তর ঝিনুকের মোতি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে মানুষের অন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ ভাল-মন্দ, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা বের হয়ে যায়। আবার দিনে জাগ্রত হলে ওইসব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনায় অন্তর ভরপুর হয়। প্রথম শ্রেণীর অলিগণের শিক্ষা ও সঙ্গ এবং দ্বিতীয় শেণীর অলিদের আত্মার শক্তির চাপেও এরূপ হয়ে থাকে।

অলিদের আহবান বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার আহবান। অলিদের কণ্ঠনালি থেকে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার বাণীই বের হয় না; বরং তাঁদের সব ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে থাকে। মাওলানা রুমি (রঃ) বলেছেন; যিনি আল্লাহর অলি হন তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দেন, আমি তোমার কণ্ঠনালি, আমি তোমার চোখ, আমি তোমার সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আমিই তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি।

বোখারী শরীফের হাদীসে কুদসীতে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছেঃ- আমার বান্দা আমার ফরয সমুহ আদায় করে আমার নৈকট্যলাভে ধন্য হয়ে নফল এবাদতসমুহ দ্বারাও অধিক

নৈকট্যলাভ করতে থাকে, এমনকি আমি তাঁকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেই ফলে আমি তাঁর কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনতে থাকে, তাঁর চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, তাঁর হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, তাঁর পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট কিছু চাইলে অবশ্যই তাঁকে আমি সেটা দিয়ে থাকি। "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় আল্লাহ তাঁর জন্য হয়ে যান"। আল্লাহর জন্য হওয়ার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সকলের উর্দ্ধে অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক হয়ে গিয়েছিলেন। বদর রণাঙ্গণে নবী করিম (দ.) শত্রু পক্ষকে সহজে পরাস্ত করতে তাদের চোখ লক্ষ্য করে একমুষ্টি কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন; হে রাসুল, বদর রণাঙ্গণে তুমি যে কাফেরদের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলে তা তুমি করনি; বরং আমিই করেছি।

আল্লাহর মুকবুল বান্দাদের সঙ্গ-সাহচর্য পরশ পাথরের মত; তাঁদের নেক নজরে পরশ পাথরও কিছু নয়। পরশ পাথর লোহাকে সোনা বানায় আর আল্লাহর অলিগণের সঙ্গ-সোহবত ও নেক দৃষ্টি মাটির মানুষকে সোনার মানুষ বানায়। আমাদের সবাইকে জীবনের সব ক্ষেত্রে সততা ও সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং সৎভাবে জীবন-যাপন করতে হবে। তাই বিশ্ব অলি শাহেন শাহ সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) মাইজভান্ডারী বলেছেন; "হালাল খাও, আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে, মক্কা ও মদিনা শরীফ আমাদের পুরান বাড়ি"। অন্যদিকে, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভান্ডারী হযরত মাওলানা শাহ অলীউল্লাহ রাজাপুরী (রঃ) বলেছেন; "আদব রাখা চাই, আদব রাখা চাই, বেয়াদবের সঙ্গ ধরলে, মুকছুদ পুরা নাই"। আবার তাঁরই একমাত্র অছিয়ত ও খেলাফতপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ রবিয়ল হোসেন (রঃ) সৎ হতে হলে সৎ ও নেক্কার মানুষের সঙ্গী হবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন; "হালালের এক টাকা হারামের লক্ষাধিক টাকার চেয়েও অতি বরকতি"। আর সৎ হতে হলে নেক্কার লোকের এবং কামেল অলি আল্লাহর সংশ্রবে থাকতে হবে। অলি আল্লাহর সঙ্গী হতে হবে তাহলে নিজকে পরিশুদ্ধ মানুষ রূপে গড়তে পারবে। সততা ও সত্যবাদিতার অভাবে আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশৃংখলা বিরাজমান যার পরিণাম মোটেই শুভ নয়। সৎ মানুষের সংশ্রবে না থাকলে মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আলাহর অপছন্দনীয় কাজে উৎসাহিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন; "হে ঈমানদারগণ তোমরা সত্যবাদিদের সঙ্গে থাক"। প্রবাদ আছে, Good company brings one heavenly bliss whilst evil company brings ruin.

আমাদের ছেলে মেয়েরা সৎ সংশ্রব না পাওয়ার কারণে আজ ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করেনা এবং দিন দিন এসব সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এসব ছেলে মেয়েরা সৎ সংশ্রব পেত তাহলে এসব অপকাজ করতে তাদের লজ্জাবোধ হত এবং বিবেক তাদের বাধা দিত। কিন্তু পারিবারিক এবং সামাজিক সৎ সংশ্রব না পাওয়ার কারণে স্বচ্ছতা-ন্যায্যতা, সততা-সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার-ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রায়ই বিপন্ন। মানবজীবন গঠনে সংশ্রবের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। তাই সুন্দর ও মজবুত ঈমানী জীবন গঠনের জন্য অলি আউলিয়া এবং সৎ ও সত্যবাদি লোকদের সংশ্রবে থাকতে হবে। রাসুলুল্লাহ (দ.) বলেছেন; "মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর আদর্শের অনুগামী হয়"। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে (তিরমিজী শরীফ)।

রাসুলুল্লাহ (দ.) আরও বলেন; সৎ লোকের সোহবত ও অসৎ লোকের সোহবতের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে, কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাঁপর ফুক দেয়ার ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতে কিছু সুগন্ধি দেবে অথবা এর সুঘ্রাণ তুমি পাবেই। পক্ষান্তরে কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তুমি পাবেই। (বুখারী, মুসলিম)। অতএব আমাদের সকলকে কামেল অলি আল্লাহর ও সৎ লোকের সংশ্রবে থাকতে হবে। ভন্ড-পীর বা অসৎ লোকের খপ্পরে পড়ে নিজের জীবন বিপর্যস্ত করা যাবে না। মছনবী শরীফে মাওলানা রুমি (রঃ) বলেছেন; কামেল অলি আল্লাহ পেলে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে নিজেকে মৃতের ন্যায় তাঁর সম্মুখে রেখে দাও।

বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যাতিরেকে তাঁর অনুসরণ কর, এতে তুমি চিরসুখময় জীবন লাভ করতে পারবে। কামেল অলির সোহবত অল্প সময়ের জন্য হলেও তার সুফল একশ বছরের রিয়াহীন এবাদত অপেক্ষা অধিক উত্তম। কারণ অলি আল্লাহর সোহবতে থেকে যে সাধনা চালানো যায় তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে এবং অল্পসময়ে সে খাঁটি মানুষে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে এবাদত বন্দেগী অতি মহৎ ও উত্তম কাজ বটে, কিন্তু শুধু তা দ্বারা খাঁটি মানুষ হওয়া সহজ নয়। কামেল অলির সোহবত থেকে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণে সংযম-সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মার শুচিতা লাভ করা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।

4th International Sufi Conference 2014

Date: 17,18,19 April 2014

Venue: Shah Alam Bir Uttam Auditorium, Chittagong Medical College.

Organized by:

Maizbhandari Academy

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA-272 PRICE: 15.00

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা।
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট, পশ্চিম গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৭. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, পশ্চিম ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বারমাসিয়া, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৪. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৯. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।
২০. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামিক একাডেমি হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং- চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
২. নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও ইবাদাতখানা।
৩. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৪. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।